৫. সেকালের কথা

আশাপূর্ণা দেবী

এই রচনাটি পড়ে ছাত্রছাত্রীদের চোখের সামনে সেকাল আর একালের মধ্যে একটি তুলনামূলক ছবি ভেসে উঠবে। রচনাটির মূল ভাব বুঝে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারবে এবং প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে লিখতে পারবে।

আজকের দিনে বসে পুরানো দিনের কথা ভাবতে গেলে মনে হতেই পারে, তাই তো। সেকালের মানুষ জীবন কাটাতেন কেমন করে? গাড়ি নেই, ট্রেন নেই, এরোপ্লেন নেই। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফুড জয়েন্ট নেই। কম্পিউটার নেই, টিভি নেই। ইলেকট্রিসিটি নেই। এত 'নেই'-এর মধ্যে তাঁরা থাকতেন কেমন করে? কিন্তু এই লেখাটি পড়ে দেখ, লেখক বলছেন, অত কিছু 'ছিল না'-র মধ্যেও তাঁরা দিব্যি ভালোই ছিলেন। কেমন করে? সে-যুগে অল্পস্বল্প যা ছিল, তাই তাঁদের খুব ভালো লাগত। আর সেই 'ভালোলাগা'টুকু সঙ্গে নিয়ে জীবন কাটাতেও তাঁদের ভালো লাগত।

রচনাটি শুরু করার আগে, পড়ুয়াদের সেকাল আর একালের কলকাতার কিছু ছবি দেখান। সেটা কলকাতা শহরের হতে পারে, গ্রামাঞ্চলের হতে পারে, গাড়িঘোড়ার হতে পারে ইত্যাদি। এই ছবিগুলি ইন্টারনেটে সহজেই পাওয়া যাবে।

বড়ো 'অল্পে সন্তুষ্ট' কাল ছিল বাপু আমাদের ছেলেবেলার কালটি। লোকজন অল্পে সন্তুষ্ট, ছেলেপুলে অল্পে সন্তুষ্ট,— সবাই ওই।

তোমাদের একালের ছোটোদের তো দেখি মুখে বুলিই হচ্ছে, 'ধেৎ ভাল্লাগছে না'।

কেন যে 'ভাল্লাগছে না' তা হয়তো তোমরা নিজেরাই জানো না। আসল কথা আশেপাশে কেবলই 'না-ভালোলাগা' মূর্তি দেখে দেখেই এই অবস্থা। আমাদের ছেলেবেলায় বাপু আমাদের সবসময়ই খুব ভালো লাগত। 'ভাল্লাগেনা' শব্দটাই জানতাম না। সকালবেলা উঠে শুধু শুধুই ভালো লাগছে। সেই 'অকারণ

ভালোলাগার' সোনালি পাতটি দিয়ে মোড়া আছে আমার ছেলেবেলা। অথচ দ্যাখো কীইবা ছিল তখন? এ যুগের পক্ষে 'কিছুই না'। গ্রামগঞ্জের কথা বাদ দাও, এই খাস কলকাতা শহরেই যা যা ছিল না, তা শুনলে তোমাদের চোখ গোল্লা হয়ে যাবে। খাস কলকাতারই মেয়ে তো আমি, এখানেই বড়ো হয়েছি। এখনও এখানে বসে বসেই বুড়ি হচ্ছি। আর দেখে চলেছি কত পরিবর্তন।

সেই কলকাতায় কী কী ছিল না তার তালিকা করতে বসলে, স্রেফ 'ছিল না'র একখানা অভিধান হয়ে যাবে।

আমাদের ছেলেবেলায় শুধু যে রিকশাই ছিল না তা নয়, 'বাস'ও ছিল না। বাসের নামও জানা ছিল না। ভাবতে পারো? ছিল শুধু ট্রামগাড়ি। আর ঘোড়ারগাড়ি। অবশ্য ঘোড়ার রকম রকম গাড়ি। ল্যান্ডো, ফিটন, ব্রুহাম, টমটম এবং ছ্যাকড়া। মোটরগাড়ি এক আধটা দেখা যেত বটে, সে সাহেব-সুবোদের, কিংবা নেহাৎ বড়োলোকদের। ট্যাক্সি? কই?

আমাদের ছেলেবেলায় 'সর্বজনীন পুজো' ছিল না, মাইক ছিল না, টুনি বাল্‌ব ছিল না, পুজোর জন্যে চাঁদা চেয়ে চেয়ে বেড়ানো ছিল না। বাড়ির মেয়েদের রাস্তায় বেরোনোর নিয়ম ছিল না। আকাশবাণী, হাওয়াই জাহাজ ছিল না। তা রিকশা-গাড়িই যখন ছিল না তখন কি আর এরোপ্লেন থাকবে? ছিল না। আমরা একটু বড়ো হবার পর উঠল। সে কী উৎসাহ উত্তেজনা! আকাশে সাড়া পেলেই ছুট ছুট ছাতে ছুট।

গাড়ির কথা বাদ দিলেও ছিল না আরও কত কী। টিভি তো দূরের কথা, রেডিওই ছিল না। ছিল না সিনেমাও। বায়োস্কোপ নামের একটা জিনিস ছিল বটে। তা সে তো নিঃশব্দ নীরব। আর স্রেফ ইংরেজি।

বললে হাসবে— ফাউন্টেন পেনও ছিল না। যখন উঠল, রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করলেন 'ঝরনা কলম'। ফাউন্টেন পেন ছিল না, ডটপেন ছিল না, প্লাস্টিক ছিল না, পলিথিন ছিল না, ফুচকা গোলগাপ্‌পা ছিল না, ম্যাগ্নোলিয়া ছিল না, নাইলন, টেরিলিন, টেরিকট, হাওয়াই চটি—বিশ্বাস হচ্ছে?

আবার দেখ, মানুষ চাঁদে উঠে খুঁটি পুঁতে আসবে, মহাশূন্যে 'রকেট স্টেশন' বানাবে, একটি মাত্র বোমা ফেলে একখানা গোটা শহর ধ্বংস করে ফেলতে শিখবে, বন্ধ হয়ে যাওয়া হার্টকে মেশিন বসিয়ে ফের চালু করতে শিখবে— এসব আষাঢ়ে গল্পে কারও বিশ্বাসের লেশও ছিল না।

বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতি, আর আরাম সুবিধের যত কিছু উপকরণ সবই বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যেই ঘটেছে আর হয়েছে। কাজেই তোমাদের যা আছে তার সাত ভাগের এক ভাগও ছিল না আমাদের। কিন্তু

তাই বলে ভেবো না লোকের জাঁকজমক সমারোহ ছিল না। সে শুনলে তোমরা হাঁ হয়ে যাবে। বর বিয়ে করতে যাবার সময় ফুলে সাজানো মোটরগাড়ি অবশ্য দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু যা দেখা যেত সে কম নয়। রাস্তায় ব্যাগপাইপে ইংরেজি বাজনা, গোরার বাদ্যি-র রব উঠলেই ছোটো জানলায়, বারান্দায়, ছাতে। কারণ এ হচ্ছে ঘটার বরযাত্রা।

আর ঘটার হলেই চার ঘোড়ার, আট ঘোড়ার, ষোলো ঘোড়ার, এমন কী বত্রিশ ঘোড়ার গাড়িও দেখা যেতে পারে। তার সঙ্গে ওই ইংরেজি বাজনা, আর অ্যাসিটিলিন গ্যাসবাতির আলোকসজ্জার শোভাযাত্রা। তেমন বেশি জাঁকজমক হলে, কাগজের তৈরি বড়ো বড়ো পুতুলের শোভাযাত্রা। হাতির সমান মাপে হাতি, ঘোড়ার মাপে ঘোড়া, উট প্রমাণ উট, তাছাড়া—দশমুন্ডু রাবণ, নাক কান কাটা সূর্পনখা, হাত-পা ছড়ানো তাড়কা রাক্ষুসি। আবার রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী এসবও থাকত।

ওই সবের মধ্যে দিয়ে কপালে জরির ঝালর ঝোলানো ঘোড়ারা যখন কদমে কদমে ছুটত সত্যিই একটা দৃশ্য ছিল।

এ তো গেল বরযাত্রার ব্যাপার। আর বিয়েবাড়ির ঘটা? যতই তোমরা বাপু এখন ডেকরেটারের বাহার দেখ আর চপ, কাটলেট, ফ্রাই, আইসক্রিম খাও, সে আমোদ উল্লাস আন্দাজও করতে পারবে না। বিয়ের আগে পরে দিন পনেরো ধরে যেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব আছে সব্বাইকে নিয়ে এসে বিয়েবাড়িতে পুরে ফেলা হবে। দুবেলা যজ্ঞি চলবে, ছোটোদের কলকোলাহল, মহিলাদের গালগল্প, কর্তাদের ডাকহাঁক, বাচ্চাদের কান্না—নইলে বিয়ে? সব মিলিয়ে বোঝা যেত, হুঁ একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে!

ভোজের বর্ণনাটা আর না-ই করলাম। শুনে তোমাদের মন খারাপ হয়ে যাবে। তবে এটা না বলে পারছি না—নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে নিমন্ত্রিতদের যাতায়াতের গাড়ি ভাড়া দেওয়া হত জোর করে হাতে গুঁজে। আর গাড়িতে তুলে দেওয়া হত মাথা পিছু এক প্লেট—মানে মাটির সরা করে মিষ্টি—আটটার কম তো নয়।

আমাদের ছেলেবেলায় অনেক কিছু না থাকলেও অনেক কিছু ছিল। যেটার নাম হৃদয়। অতএব নেমন্তন্ন বাড়িতে থাকার জন্যে ছোটো ছেলেদের ইস্কুল কামাই হত অবশ্যই। কিন্তু তাই কী? উঠতে বসতে এত পরীক্ষা তো ছিল না। আর ছেলের ওজনের চাইতে ভারী ওজনের বই খাতাও ছিল না।

পড়বে তো সারা বছর, তা বলে ছেলেমানুষেরা বিয়ে বাড়িতে, আমোদ আহ্লাদ করবে না? আর যতদিন ইস্কুলে ততদিন ছেলেমানুষই। ব্যঙ্গ হাসি হাসছ? তা হাসো। তবে মনে রেখো এই পরিস্থিতির মধ্যেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মহা মহা বিদ্বান পণ্ডিতজনেরা শতাব্দীটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে গেছেন। আর এখনকার বাবা কাকারা সেই পড়া পড়েই ছেলেমেয়ের চলার পথ সোনা দিয়ে মুড়ছেন।

বেশি কথা কী, এটাই ভাবো না, রবীন্দ্রনাথ কেরোসিনের আলোয় দোয়াতে কলম ডুবিয়ে লিখে 'রবীন্দ্রনাথ' হয়েছেন। আর বীরভূমের প্রচণ্ড গরমে তালপাতার পাখার হাওয়া খেতে খেতে গান লিখেছেন, 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।'

আসলে সবই তুলনামূলক। এখন তোমরা আমাদের কালের 'নেই'-এর তালিকা শুনে ভাবছ নিশ্চয়ই, আহা বেচারিরা! কী দুঃখীই না ছিল, কী দুঃখী! কিন্তু ছিল ওই সন্তোষ।

অল্পে সন্তোষ।

শুধু সাধারণ লোকজন, আর ছেলেপুলেরাই যে অল্পে সন্তুষ্ট ছিল তা নয়। দ্যাখো কাগজে সম্পাদকরাও তাই

ছিলেন। তা না হলে আমাকে কী আর আজ 'লেখিকা' হতে হত বাছা!

'লেখা'য় হাত দিয়ে বসেছি, সেও তো সেই 'ছেলেবেলাতেই'। স্রেফ তেরো বছর বয়সে। আর দুঃসাহসে ভর করেই সেই 'হাতেখড়ি' লেখাটাই পাঠিয়ে দিয়েছি এক সম্পাদকের দপ্তরে, 'ওমা তক্ষুনি সে লেখা ছেপে বার করলেন সেই সম্পাদক মশাই আর সঙ্গে সঙ্গে চিঠি, '' খাসা হয়েছে। আবার লেখ, আবার পাঠাও''। '

তবেই বল, সেই 'কাল' টা কী ভালো ছিল! তিনি যদি অমন সন্তুষ্টচিত্ত না হতেন, হাতেখড়ি লেখা কে বাজে কাগজের ঝুড়ি তে ফেলে দিতেন, আবার বারে বারে না চাইতেন—আশাপূর্ণা দেবীর তো 'আশাপূর্ণা দেবীর' হবার বারোটা বাজা যেত।

তাই বলছিলাম, আমাদের ছেলেবেলাটা বড়ো ভালো কালই ছিল বাপু।

জেনে রাখো

সংক্ষেপে লেখকের কথা: আশাপূর্ণা দেবী। জন্ম ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়। বাবা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কোনো কলেজে পড়ার সুযোগ তিনি পাননি। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূ এবং জননীর ভূমিকা পালন করতে করতেই তিনি অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। বড়োদের এবং ছোটোদের —দুরকম রচনাতেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সহজ কথা সহজ করে বলার কাজটাই সবচেয়ে কঠিন— এই কঠিন কাজটিই আশাপূর্ণা দেবী একনাগাড়ে প্রায় ৭০ বছর ধরে তাঁর অজস্র সাহিত্য-রচনার মধ্যে দিয়ে করে গিয়েছেন। ছোটোদের জন্য তাঁর লেখা কয়েকটি বই: ওনারা থাকবেনই, কত কান্ড রেলগাড়িতে, জীবনকালীর পাক্কা হিসেব, নিখরচয়া আমোদ, ভূতুড়ে কুকুর, রহস্যের সন্ধানে, রাজকুমারের পোশাকে, গজ উকিলের হত্যারহস্য, প্রভৃতি। প্রথম প্রতিশ্রুতি গ্রন্থের জন্য ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার, 'জ্ঞানপীঠ' লাভ করেন এছাড়াও তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্যে তিনি পেয়েছেন—রবীন্দ্র পুরস্কার সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. ডিগ্রি ও সরকারি খেতাব। ১৯৯৫ সালের ১৩ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই লেখাটি কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রকাশিত খুশির খেয়া নামের শিশু ও কিশোর সংকলন থেকে গৃহীত।

সংক্ষেপে রচনার কথা: এই লেখায় লেখেক তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলির কয়েকটি ছবি এঁকেছেন। সে যুগে সবাই অল্পে খুশি থাকত। কিন্তু এখনকার ছোটোরা সবসময়েই বলে ভাল্লাগেনা। কেন যে ভালো লাগে না তা হয়তো তারা নিজেরাই জানে না। ছেলেবেলায় লেখকের কিন্তু সবই ভালো লাগত। যদিও তাঁর ছেলেবেলায় কলকাতায় অনেক কিছুই ছিল না। রিকশা ছিল না, বাস ছিল না। থাকার মধ্যে ট্রাম আর নানারকম ঘোড়ার গাড়ি। এরোপ্লেন যখন এল তা ছিল একটা দেখবার জিনিস। আজকের মতো ফাউন্টেন পেন, রেডিও, টিভি, সিনেমা, সর্বজনীন পুজো— কিছুই ছিল না। ফুচকা গোলগাপ্পার মতো খাবার, টেরিলিন, টেরিকটের পোশাক, পলিথিন ব্যাগ, হাওয়াই চপ্পলও ছিল না। চাঁদে মানুষ যাবে, আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরে বেড়াবে, অ্যাটম বোমায় শহর ধ্বংস হয়ে যাবে, এসব কথা মানুষ তখন কল্পনাও করেনি।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের জীবনযাপন আগের চাইতে অনেক আরামের হয়েছে, সুবিধের এত রকমের উপকরণ আগে ছিল না। কিন্তু জাঁকজমকের ঘটা সে যুগেও ছিল। আট কি ষোলো ঘোড়ার গাড়ি, ইংরেজি বাজনা, গ্যাসবাতির আলোকসজ্জা, কাগজের তৈরি বড়ো বড়ো পুতুল, জীবজন্তু, দেবদেবী, রাক্ষস— এইসব নিয়ে শোভাযাত্রা করে বর বিয়ে করতে যেত। বিয়েবাড়িতে এলাহি ভোজের আয়োজন, আত্মীয়স্বজনের ভিড় লেগে থাকত। নিমন্ত্রিতরা বিয়েবাড়িতে যাতায়াতের ভাড়া পেতেন, যাবার সময় তাঁদের সঙ্গে মিষ্টি দিয়ে দেওয়া হত। ছোটোদের পড়াশোনা, পরীক্ষার চাপ এখনকার মতো ছিল না, তাই তারা স্কুল কামাই করে বিয়েবাড়ি যেত। এখনকার মতো পড়াশোনার চাপ না থাকলেও সে যুগে অনেক পণ্ডিত মণীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মূল্যবান রচনা পড়েই আমরা সামনে এগিয়ে চলেছি। অনেক কিছু না থাকার সেই যুগই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। আসলে এখনকার যুগে অনেক কিছু আছে বলেই সে যুগে কিছু ছিল না বলে মনে হয়। পুরো ব্যাপারটাই তুলনামূলক। তাই এ যুগের তুলনায় সে যুগের মানুষ দুঃখী ছিলেন, এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। তখন সবাই অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন এমনকি পত্রিকার সম্পাদকও। তাই তেরো বছর বয়সে লেখিকা যে লেখাটি লিখে পত্রিকা—

দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন তা ছাপা হয়েছিল এবং এবং সম্পাদক তাঁকে আরও লেখা পাঠাতে বলেছিলেন।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

অভিধান—যে বইতে শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকে, শব্দকোষ। Dictionary.

আবাঢ়ে গল্প—একটি প্রবচন। অবিশ্বাস্য, অবাস্তব গল্প

ঘটার বরযাত্রা—খুব আড়ম্বর বা সমারোহ করে যে বরযাত্রা হয়। এখানে ঘটা শব্দ বিশেষ্য। ঘটা শব্দের অন্য মানে সংঘটিত হওয়া বা ঘটবে এমন। এখানে ঘটা ক্রিয়াপদ

কুটুম্ব বা কুটুম—আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি

যজ্ঞি চলবে—যজ্ঞ শব্দের কথ্য রূপ যজ্ঞি। শাস্ত্র মেনে যে কোনো অনুষ্ঠান। এখানে অর্থ ভোজের এলাহি আয়োজন। বিয়েবাড়িকে যজ্ঞি বাড়িও বলা হয়

'হাতেখড়ি লেখা'—হাতে খড়ি ধরে প্রথম লিখতে শেখা হল হাতেখড়ি। লেখকের প্রথম লেখা অর্থাৎ ওই লেখাটি লিখে লেখার হাতেখড়ি হল

দপ্তর—কার্যালয়। office ফারসি শব্দ

ব্যাখ্যা

১। ...অকারণ ভালোলাগার সোনালি পাতটি দিয়ে মোড়া...

মনের ভাবটি কী চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন দেখো। 'অকারণ ভালোলাগার' কারণ খুঁজে তাকে কি ব্যাখ্যা করা যায় ? যায় না। এটা হল পুরোপুরি উপলব্ধির ব্যাপার। নীল আকাশে হালকা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে— দেখে তুমি বলে উঠলে: বাঃ ! কী সুন্দর ! কী ভালো লাগছে দেখতে ! এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়— কেন ভালো লাগছে, কোনটা ভালো লাগছে— তুমি বলতে পারবে না। কারণ আকাশের নীল রং, মেঘের সাদা রং, বা তার ভেসে যাওয়া— কোনোটাই আলাদা করে তোমার ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে সব মিলিয়ে যে দৃশ্যটি তৈরি হয়েছে সেটা। মুখে কারণ বলতে না পারলেও ভেতরে ভেতরে তুমি ভালোলাগাটা উপলব্ধি করতে পারছ। এটাই অকারণ ভালোলাগা। সে যুগে অনেক কিছুই ছিল না। কিন্তু যা ছিল তা সবই লেখকের ভালো লাগত। কেন ভালো লাগত তা জানতেন না। আর এত ভালো লাগত যে মনে হত সব সোনার পাতে মোড়া রয়েছে। সোনার পাত কেন ? এই ভালোলাগাটা বড্ড দামি কিনা তাই তাকে আর একটা দামি জিনিস দিয়ে যত্ন করে মুড়ে রাখা।

২। এখনকার ছোটোদের বাবা কাকারা সেই পড়া পড়েই ছেলেমেয়ের চলার পথ সোনা দিয়ে মুড়ছেন।

উনিশ শতকে আমাদের দেশে অনেক পণ্ডিত মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম তোমরা জানো— রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি। মানুষের মতো মানুষ হতে গেলে কী করা উচিত তা তাঁদের লেখা বই পড়ে বা তাঁদের জীবনযাপন দেখে শেখা যায়। লেখক বলেছেন, তোমাদের গুরুজনেরা তাঁদের কাছ থেকে যা যা শিখেছেন, সে সবই এখন শেখাচ্ছেন তোমাদের, যাতে জীবনের সঠিক পথে তোমরা চলতে পারো, মানুষের মতো মানুষ হতে পারো। ওই মনীষীরা যে যুগে জন্মেছিলেন তখন আজকের মতো আরামে জীবনযাপন করার অনেক উপকরণই তাঁরা পাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ হতে পেরেছিলেন। তার মানে, সহজ, সরল জীবনযাপন করেও মানুষের মতো মানুষ হওয়া যায়।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো

ক) সেকালে কতরকমের ঘোড়ার গাড়ি ছিল ? তাদের নাম কী কী ?

খ) 'আকাশবাণী' বললে কী বোঝায় ?

গ) রবীন্দ্রনাথ 'ফাউন্টেন পেন'-এর কী নামকরণ করেছিলেন ?

ঘ) রাবণ, সূর্পনখা ও তাড়কা রাক্ষসীর কথা কোন মহাকাব্যে আছে ?

ঙ) সেকালের মানুষ কি সত্যি দুঃখী ছিলেন ?

চ) পত্রিকা—সম্পাদক লেখককে কী লিখেছিলেন ?

২. এককথায় উত্তর দাও: 'হ্যাঁ' অথবা 'না' - এর পাশে ✓ চিহ্ন দাও

ক) ফিটন একরকম ঘোড়ার গাড়ি। হ্যাঁ / না

খ) 'দূরদর্শন' কেন্দ্রের পুরানো নাম 'আকাশবাণী'। হ্যাঁ / না

গ) হাওয়াই জাহাজ আর এরোপ্লেন একই। হ্যাঁ / না

ঘ) সেকালে ইংরেজদের গোরা বলা হত। হ্যাঁ / না

ঙ) আশাপূর্ণা দেবী লেখা শুরু করেন ১৩ বছর বয়সে। হ্যাঁ / না

৩. সংক্ষেপে পরিচয় দাও।

টমটম সর্বজনীন পুজো 'হাতেখড়ি' লেখা

৪. ছোটো প্রশ্ন: সংক্ষেপে উত্তর লেখো

ক) 'মোটরগাড়ি এক আধটা দেখা যেত বটে, ...' সে-গাড়িতে কারা চড়তেন ?

খ) 'আকাশে সাড়া পেলেই ছুট ছুট ছাতে ছুট।'—কীসের সাড়া ? ছুট কেন ?

গ) 'তা সে তো নিঃশব্দ নীরব।'—কে ? তাকে সেকালে কী নামে ডাকা হত ?

ঘ) 'সব মিলিয়ে বোঝা যেত, হুঁ একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে।' —ব্যাপারটা কী ?

ঙ) '...সেই ''হাতেখড়ি'' লেখাটাই পাঠিয়ে দিয়েছি...' কোথায় ? লেখাটার কী হল ?

৫. বড়ো প্রশ্ন— পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো

ক) 'কলকাতায় কী কী ছিল না তার তালিকা করতে বসলে, স্রেফ একখানা ''ছিল না''-র অভিধান হয়ে যাবে।'

যানবাহন কী কী ছিল না	:	১.	২.	৩.
আমোদপ্রমোদ কী কী ছিল না	:	১.	২.	৩.
লেখার উপকরণ কী কী ছিল না	:	১.	২.	৩.
খাবার কী কী ছিল না	:	১.	২.	৩.

খ) 'কারণ এ হচ্ছে ঘটার বরযাত্রা।' এই বরযাত্রার—

১) গাড়ি কীরকম ? ২) বাজনা কীরকম ? ৩) আলোকসজ্জা কীরকম ? ৪) পুতুল কীরকম ?

গ) 'এসব আষাঢ়ে গল্পে কারও বিশ্বাসের লেশও ছিল না।'—কোন কোন ঘটনাকে 'আষাঢ়ে গল্প' বলা হয়েছে ?

ঘ) 'তোমাদের একালের ছোটোদের তো দেখি মুখে বুলিই হচ্ছে, ''ধেৎ ভাল্লাগছেনা।'' ' —তুমিও কি তাই মনে করো? তোমার মতামত বুঝিয়ে লেখো।

ঙ) 'খুব আরামে জীবনযাপন না করেও মানুষের মতো মানুষ হওয়া যায়।' —এরকম একটি বিতর্কসভা হলে তুমি এর পক্ষে বলবে, না বিপক্ষে ? —কারণ দেখিয়ে বুঝিয়ে লেখো।

চ) তোমার ছেলেবেলার সঙ্গে লেখকের ছেলেবেলার পার্থক্যটা 'আছে' আর 'নেই' দিয়ে ভেবে ভেবে লেখার চেষ্টা করো।

৬. বুঝিয়ে লেখো

ক) 'সেই ''অকারণ ভালোলাগা''-র সোনালি পাতটি দিয়ে মোড়া আছে আমার ছেলেবেলা।'

খ) 'তা না হলে আমাকে কী আর আজ ''লেখিকা'' হতে হত বাছা' ?

ব্যাকরণ

ক) লিঙ্গ পরিবর্তন করো: বুড়ি, মেয়েদের, বিদ্বান, লেখিকা, রাক্ষসী

খ) কোনটা কোন বচন: তোমরা, মেয়েদের, বেচারিরা, আমার, তোমার

গ) পদ-পরিবর্তন করো: কৌশল, বিশ্বাস, বাহার, সন্তুষ্ট, পরীক্ষা

ঘ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখো: আসল, জানা, সন্তুষ্ট, হাসি, নিয়ম

জানতে কি ?

যজ্ঞি-বাড়ির রান্না

১০০ বছর আগে কলকাতার ধনীগৃহে শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভোজের মেনু কী হত জানিয়েছেন **শরৎকুমারী** চৌধুরাণী, ''রান্না হইয়াছে পোলাও, কালিয়া, চিংড়ি মালাই কারি, মাছ দিয়া ছোলার ডাল, রোহিতের মুড়া দিয়া মুগের ডাল, আলুর দম, ছোকা, মাছের চপ, চিংড়ির কাটলেট, ইলিশ ভাজা, বেগুন ভাজা, শাক ভাজা, পটোল ভাজা, দইমাছ, চাটনি, তারপর লুচি, কচুরি, পাঁপরভাজা, একখানি সরাতে খাজা, গজা, নিমকি, রাধাবল্লভি, সিঙ্গাড়া, দরবেশ, মেঠাই, একখানা ঝুরিতে আম, কামরাঙ্গা, তালশাঁস ও বরফি সন্দেশ, আর একখানায় ক্ষীরের লাড্ডু, গুজিয়া, গোলাপজাম ও পেরাকি। ইহার উপর ক্ষীর, দধি, রাবড়ি ও ছানার পায়স। বাবুদের জন্য মাংসের কোর্মা ছিল, কিন্তু মেয়েরা অনেকেই মাংস খান না, এ জন্য তাহা মেয়েদের মধ্যে পরিবেশন করা হইল না।''

কি, সত্যি তোমাদের মন খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

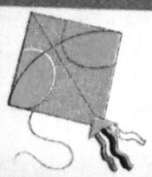

তখনকার দিনে এখনকার মতন সুযোগ-সুবিধা ছিল না বটে, কিন্তু এমন অনেক জিনিষ ছিল যা আমরা আর এখনকার দিনে দেখতে পাইনা যেমন- হাতেটানা পাখা, গ্রামোফোন রেকর্ড, পালকী, ইত্যাদি। সেসব তোমরা তোমাদের দাদু, দীদা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো জানতে পারবে।

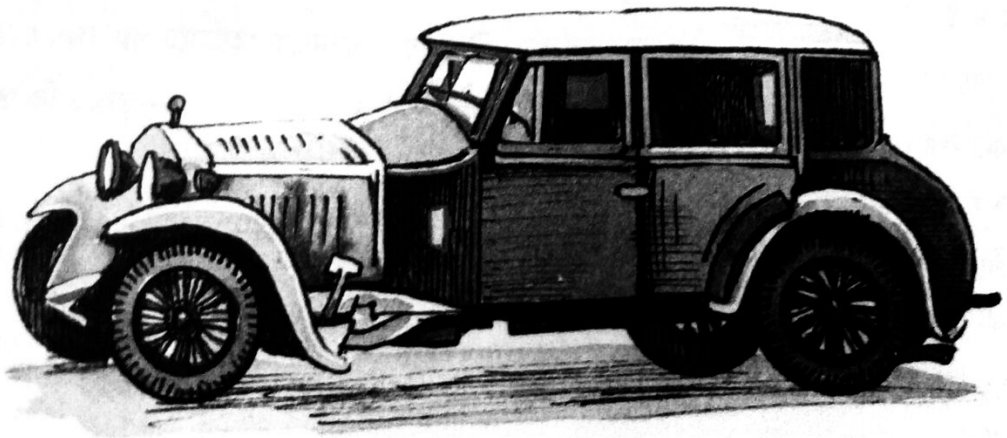

৮. প্রভাত

দীনবন্ধু মিত্র

ছাত্রছাত্রীরা এই কবিতাটির মধ্যে দিয়ে গ্রামবাংলার প্রভাতের একটি মোহময়ী ছবি দেখতে পাবে। তারা তাদের কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে এই কবিতাটির আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

রাত পোহালো, ফরসা হলো,
ফুটলো কত ফুল।
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা,
জুটলো অলিকুল॥
পূর্ব ভাগে, নবীন রাগে,
উঠলো দিবাকর।
সোনার বরণ, তরুণ তপন,
দেখতে মনোহর॥
ঘরের চালে, পালে পালে,
ডাকছে কত কাক।
পূজা-বাটিতে, জোড়-কাঠিতে,
বাজছে যেন ঢাক॥
মাথা তুলি, মরালগুলি,
নদীর কূলে ধায়।
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে,
সাঁতার দিয়ে যায়॥
কত কুমারী, সারি সারি,
দুলছে কানে দুল।
কানন হতে, কচুর পাতে
আনছে তুলে ফুল॥
তাড়ি বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালাতে যায়।
পথে যেতে, কোঁচড় হতে
খাবার নিয়ে খায়॥
এই বেলা, সকাল বেলা,
পাঠে দিলে মন।
বৈকালেতে, গৌরবেতে,
রবে জাদুধন॥

জেনে রাখো

সংক্ষেপে কবির কথা: দীনবন্ধু মিত্র। বাবার দেওয়া নাম গন্ধর্বনারায়ণ। জন্ম ১৮৩০ সালে, নদিয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। বাবা, কালাচাঁদ মিত্র। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার পর বাবা তাঁকে বালক বয়সেই জমিদারি সেরেস্তার কাজে লাগিয়ে দেন। কিন্তু আরও পড়াশোনার আগ্রহে দীনবন্ধু কলকাতায় পালিয়ে আসেন এবং কাকার বাড়িতে থেকে বাসন মাজার কাজ করে লেখাপড়া চালাতে থাকেন। পাদরি লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (হেয়ার) থেকে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। কলেজের সব পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। শেষ পরীক্ষা না দিয়ে পাটনার পোস্টমাস্টারের চাকরি নেন। অল্পদিনের মধ্যে পোস্টাল ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই নানা পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে নীলদর্পণ নাটক লিখে তিনি সারা দেশে সাড়া ফেলে দেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, নাটক—নবীন তপস্বিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, লীলাবতী, সধবার একাদশী, জামাই বারিক। কাব্য—সুরধুনী কাব্য, দ্বাদশ কবিতা। উপন্যাস—যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, পোড়া মহেশ্বর। ১৮৭৩ সালের ১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। এই কবিতাটি দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ-এর অন্তর্গত বিবিধ কবিতা নামের অংশ থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত।

সংক্ষেপে কবিতার কথা: এই কবিতায় কবি গ্রামের ভোরবেলাকার একটি ছবি এঁকেছেন। রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে চারিদিক ফরসা হয়েছে। নীল রঙের পতাকার মতো ডানা কাঁপিয়ে ভ্রমরের দল এসে জুটেছে ফুলের চারপাশে। পুব আকাশে ভোরের সোনারং আলো নিয়ে যে সূর্য উঠেছে তা দেখতে খুবই সুন্দর। ঘরের চালায় কাকের দল কলরব করছে। পুজোর বাড়ি থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। রাজহাঁসের দল নদীতে নেমে সাঁতার কাটছে। মেয়ের দল বাগান থেকে ফুল তুলে কচুর পাতায় রাখছে। পাততাড়ি বগলে ছেলের দল পাঠশালায় যাচ্ছে। যেতে যেতে তারা কোঁচড় থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছে। সকালবেলা মন দিয়ে পড়াশোনা করলে বিকেলে সবাই তাদের আদর করবে।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

পোহালো—ভোর হল

জুটলো—জড়ো হল

অলিকুল—ভ্রমরের দল

নবীন রাগে— নতুন রঙে বা সাজে। 'রাগ' শব্দটির অনেক মানে: ১. রং ২. প্রসাধন ৩. ভালোবাসা ৪. ক্রোধ, ৫. উচ্চাঙ্গ সংগীত সুর

দিবাকর—সূর্য। বিপরীত— নিশাকর

পূজা-বাটি—পুজোর বাড়ি

জোড় কাঠি—এক জোড়া কাঠি। দুটো কাঠি দিয়ে ঢাক বাজাতে হয়।

ঢাক—চামড়ায় ঢাকা বড়ো বাজনা, যা দুটো কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়

কূল—তীর, তট। বানান যদি 'কুল' হয় তাহলে অর্থ: ১. বংশ, কোষ্ঠী ২. এক ধরনের টকমিষ্টি ছোটো ফল

কুমারী—অবিবাহিত মেয়ে

কানন—বাগান। অন্য মানে— বন, অরণ্য, বনানী

তাড়ি—লিখবার জন্য তালপাতার ছোটো গোছা বা তাড়া

কোঁচড়—ধুতি বা শাড়ির অংশ ধরে বা গুঁজে তৈরি থলের মতো আধার

বানান দেখে রাখো: পূর্ব— পুব বর্ণ— বরন পূজা—পুজো

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো

ক) কবিতাটি কার লেখা ?

খ) কবিতার প্রথম ১২ লাইন মুখস্থ বলো।

গ) পূজা-বাটিতে ঢাক বাজছে কেন?

ঘ) যারা ঢাক বাজায় তাদের কী বলে?

ঙ) কুমারীদের কানে কী দুলছে?

চ) ছেলেরা কী নিয়ে পাঠশালায় যাচ্ছে?

ছ) সকালে পাঠে মন দিলে বিকেলে কী হয়?

জ) প্রভাতের এই দৃশ্য কি শহরে দেখা যাবে?

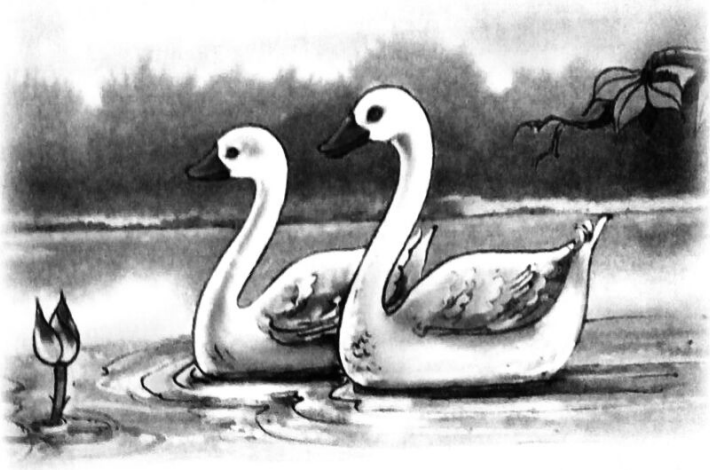

২. এক কথায় উত্তর দাও

ক) অলির দল কোথায় এসে জুটেছে?

খ) দিবাকর কোন্ দিকে ওঠে?

গ) কাকের দল কোথায় বসে কলরব করছে?

ঘ) ঢাক বাজছে কোথায়?

ঙ) মারালগুলি কোথায় সাঁতার কাটছে?

৩. ডান দিকের সঙ্গে বাঁ-দিক মিলিয়ে আবার লেখো

ক) অলিকুল	পূজা-বাটি
খ) দিবাকর	কাঁপিয়ে রাখা
গ) ঢাক	ছেলের দল
ঘ) সাঁতার	পূর্বভাগে
ঙ) পাঠশালা	মরালগুলি

৪. বড়ো প্রশ্ন: পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো

ক) প্রভাত কবিতা অবলম্বনে গ্রামের ভোরবেলার চিত্রটি বর্ণনা করো।

খ) প্রভাত কবিতায় কবি প্রকৃতির যে চিত্রটি এঁকেছেন তার রূপ সরল গদ্যে গুছিয়ে লেখো।

গ) প্রভাতে কে কী কাজ শুরু করেছে?—কবিতা অবলম্বনে তার পরিচয় দাও।

ব্যাকরণ

১. **অর্থ লেখো:** আলিকুল দিবাকর তাড়ি কোঁচড়

২. **বাক্য রচনা করো :** পালে পালে সারি সারি

৩. **বিপরীত শব্দ লেখো :** রাত নবীন ফরসা জোড় শান্ত বেলা গৌরব

৪. **লিঙ্গ পরিবর্তন করো :** তরুণ মরাল কুমারী ছেলে

কবির যেমন ভোরবেলা পছন্দ, দিনের কোন সময়ে টা তোমার খুব প্রিয়। সেই সময় নিয়ে একটা কবিতা লেখো।

ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন যে, সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা ওদের চারপাশে কী কী দেখতে পায়। সকাল ও রাতের চিত্রের মধ্যে কী তফাত তারা খুঁজে পায়? একটি আলোচনার পরিবেশ তৈরি করুন যাতে পড়ুয়ারা নিজেদের মতামত আত্মবিশ্বেসের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারে।

৯. এক ভূতুড়ে কাণ্ড

শিবরাম চক্রবর্তী

পড়ুয়ারা এই মজার গল্পটি উপভোগ করতে পারবে। শব্দকোষের সাহায্য নিয়ে কঠিন শব্দের মানে খুঁজতে পারবে এবং প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা বুঝে তার উত্তর দিতে পারবে।

শিবরাম চক্রবর্তী মজার গল্প লিখতেন। একেবারে যারা গোমড়ামুখো, মোটেও হাসতে জানে না, তারাও তাঁর লেখা পড়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। পড়বার সময় বিশেষ করে লক্ষ করবে গল্পে তাঁর ভাষার ব্যবহার। শব্দ নিয়ে এই যে খেলা, তাঁর লেখার এটাই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শব্দ নিয়ে মজা করলেও এই গল্পের শুরুতেই একটা গা-ছমছমে ভূতুড়ে পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় তারপর কী হবে? —সেটা পড়েই দ্যাখো। খবরদার! গল্পের শেষটা আগে পড়ে নিলে কিন্তু সব মাটি!

বন্ধুর একটা সাইকেল হাতে পেয়ে হুনড়ুর দিকে পাড়ি জমিয়েছিলাম। কিন্তু মাইল সাতেক না যেতেই তার একটা টায়ার ফেঁসে গেল।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়— একটা কথা আছে না? আর যেখানে সন্ধে হয় সে খানেই সাইকেলের টায়ার ফাঁসে।

জনমানবহীন পথ। আরও মাইল পাঁচেক যেতে পারলে গাঁয়ের মতো একটা পাওয়া যেত। কিন্তু সাইকেল ঘাড়ে করে যেতে হলেই হয়েছে। এমনকি, সাইকেল ফেলে, শুধু পায়ে হেঁটে যেতেও পারব কী না সন্দেহ ছিল।

তখনও সন্ধে হয়নি। এই হব হব করছে। সামনে গেলে পাঁচ মাইল, ফিরতে হলে সাত— দুদিকেই সমান পাল্লা। কোন দিকে হাঁটন দেব হাঁ করে ভাবচি।

ভাবতে ভাবতে আরও আধঘণ্টা কাটালাম। অবশেষে দেখি একখানা লরি। খুব জোরেও নয়, আস্তেও নয়, আসতে দেখা গেল সেই পথে। রাঁচির দিকেই যাচ্ছিল লরিটা। সঙ্গে একটা টর্চ ছিল। সেটা জ্বালিয়ে নিয়ে প্রাণপণে ঘোরাতে লাগলাম। শীতের রাত, ফিকে চাঁদের আলো, তার ওপরে কুয়াশার পর্দা পড়েছে। এর মধ্যে আমার টর্চের আলো ড্রাইভার দেখতে পেলে হয়।

লরিটা এসে পৌঁছল—এল একেবারে সামনাসামনি। মুহূর্তের জন্যই এল, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও থামলে না। যেমন এল, তেমনি চলে গেল নিজের আবেগে। রাস্তার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

অনর্থক কেবল টর্চটাকে আর নিজেকে টর্চার করা।

শেষটা কি হাঁটাই আছে কপালে? এই ঝাপসা আলো আর কুয়াশার মধ্যে সাইকেল টেনে পাক্কা সাত মাইলের ধাক্কা। ভাবতেই আমার বুকটা দুরদুর করতে থাকে।

এর মধ্যে কুয়াশা আরও জমেছে। চাঁদের আলো ফিকে হয়ে এসেছে আরও। নিজেকে প্রাণপণে প্রবোধ দিচ্ছি। এমন সময় দুটো হলদে রঙের চোখ কুয়াশা ভেদ করে আসতে দেখা গেল। বাঘ নাকি? ... না বাঘ নয়। দুই চোখের অতখানি ফারাক থেকে বোঝা যায়।

আবার আমি টর্চ ঘোরাতে লাগলাম।

একটা ছোট্ট বেবি অস্টিন। আস্তে আস্তে আসছিল গাড়িটা— এত আস্তে যে মানুষ পা চালালে বোধ হয় এর চেয়ে জোরে চলতে পারে।

আসতে আসতে গাড়িটা আমার সামনে এসে পড়ল।

আমি হাঁকলাম - এই!

কিন্তু গাড়িটা থামবার কোনো লক্ষণ নেই। তেমনি মন্থর গতিতে চলতে লাগল গাড়িটা। আমার পাশ কাটিয়ে চলে যায় দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। না, আর দেরি করা যাবে না, এক্ষুনি একটা কিছু করে ফেলা চাই। এসপার-ওসপার যা হোক। গাড়ির মালিকের না হয় ভদ্রতারক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাকে তো আত্মরক্ষা করতে হবে?

অগত্যা আগায়মান গাড়ির গায় গিয়ে পড়লাম। দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। চলন্ত গাড়িতে ওঠা সহজ নয়, নিরাপদও না, কী করব এক মিনিটও নষ্ট করার ছিল না। কে জানে, এ-ই হয়তো সশরীরে রাঁচি ফেরার শেষ সুযোগ।

সাইকেলটা রাস্তার ধারে ধরাশায়ী হয়ে থাকল। থাকগে, কী করা যাবে? নিতান্তই যদি রাত্রে বাঘের পেটে না যায়, (বাঘেরা কি সাইকেল খেতে ভালোবাসে?) কাল সকালে উদ্ধার করা যাবে।

ছোট্ট গাড়ির মধ্যে যতটা আরাম করে বসা যায় বসেচি। বসে ড্রাইভারকে লক্ষ করে বলতে গেছি— 'আমায় লালপুরার মোড়টায় নামিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে—'

বলতে বলতে আমার গলার স্বর উপে গেল, বক্তব্যের বাকিটা উচ্চারিত হল না। আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম— আমার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল।

যেখানটায় ড্রাইভার থাকবার কথা সেখান কেউ নেই।... একদম ফাঁকা...

জিভ্ আমার টাকরায় আটকেছিল। কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলে বাকশক্তি ফিরে পেলাম। 'ভূত, ভূত ছাড়া কিছু না।' আপনা থেকেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। আমার কথায় ভূত যে কর্ণপাত করল তা মনে হল না। বে-ড্রাইভার গাড়ি যেমন চলছিল তেমন চলতে লাগল।

ড্রাইভার নেই, এবং গাড়ির ইঞ্জিনও চলছিল না। তবু গাড়ি চলছিল, এবং ঠিক পথ ধরেই চলছিল। এই কথা ভেবে, এবং হেঁটে যাওয়ার চেয়ে বসে যাওয়ার আরাম বেশি বিবেচনা করে, প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে সেই ভূতুড়ে গাড়িকেই আশ্রয় করে রইলাম।

ঘণ্টা দুয়েক পরে গাড়িটা লেভেল ক্রসিং—এর মুখে এসে পৌঁছেচে। ক্রসিং-এরে গেট পেরিয়ে যখন প্রায় লাইনের সম্মুখে এসে পড়েছি তখন হুঁশ হল আমার। হুশ হুশ করে তেড়ে আসছিল একটা আওয়াজ। চমকে উঠলাম। আপ কিংবা ডাউন— একটা গাড়ি এসে পড়ল বলে— অদূরে তার ইঞ্জিনের আলো দেখা দিয়েছে। —কিন্তু আমার গাড়ির থামবার কোনো উৎসাহ নেই। ...বিনে ভাড়ায় আমি চেপে চলেছি বলে কি অদৃশ্য ভূত

আমায় টেনে নিজের দল ভারী করতে চায় নাকি?

আমার গাড়ির হাতলটা কোথায়? এক্ষুনি নেমে পড়া দরকার— আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই হয়েছে!

কোনো রকমে দরজা খুলে তো বেরিয়েছি। আমিও নেমেছি আর আমার গাড়িও থেমেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে দিয়ে রেলগাড়িটা গর্জন করতে করতে বেরিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার সম্বিত ছিল না। হুশ হুশ করে ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর আমার হুঁশ হল।

নাঃ, মারা যাইনি। জলজ্যান্ত রয়েছি এখনও। এবং মোটর গাড়িটাও চুরমার হয়নি। আমার পাশেই— ছবির মতো দাঁড়িয়ে—

এমন সময়ে চোখে চশমা লাগানো একটি লোক বেরিয়ে এল মোটরের পিছন থেকে। 'আমাকে একটু সাহায্য করবেন?' এগিয়ে এসে বললেন ভদ্রলোক 'যদি দয়া করে গাড়িটা ঠেলে দ্যান, মশাই। আট মাইল দূরে গাড়িটার কল বিগড়েছে, সোখান থেকে একলাই ঠেলতে ঠেলতে আসছি। পথে একজনকেও পেলাম যে আমার সঙ্গে হাত লাগায়। যদি একটু আমার সঙ্গে যোগ দেন— লাইনটা পেরিয়ে আরেকটু গেলেই আমার বাড়ি। ঐ যে দেখা যাচ্ছে— আর এক মিনিটের ওয়াস্তা।'

জেনে রাখো

সংক্ষেপে লেখকের কথা: শিবরাম চক্রবর্তী। জন্ম ১৩ ডিসেম্বর, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতায় মামার বাড়িতে। পৈতৃক নিবাস জরুরবাকলা, মুর্শিদাবাদ। ছোটোবেলা থেকেই বাইরের জগৎ তাঁকে টানত। অল্প বয়সেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় থাকবেন, কী খাবেন সে সব কথা চিন্তা না করেই। বাড়ি থেকে পালিয়ে নামে তাঁর একটি চমৎকার বই-ও আছে। তাঁর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য, কথার পিঠে কথা বসিয়ে 'পান' (pun) বা শব্দ নিয়ে মজা করা। স্কুলে পড়ার সময় স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জেল খেটেছেন। সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি ছোটোদের অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। নিজের নামের বানান নিয়েও তিনি মজা করেছেন। লিখতেন শিব্রাম চকরবরতি। তাঁর লেখা আরও কয়েকটি গ্রন্থ রক্তের টান, প্রজাপতির পক্ষপাত, ভালোবাসার অ আ ক খ, কে হত্যাকারী?, বর্মার মামা, গল্প সংগ্রহ প্রভৃতি। মৃত্যু ২৮ অগাস্ট, ১৯৮০ খিস্টাব্দ। সংকলিত রচনাটি শিবরাম অমনিবাস থেকে সংক্ষেপ করে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে রচনার কথা: বন্ধুর কাছ থেকে সাইকেল চেয়ে নিয়ে তাতে চেপে লেখক হুনড্রু জলপ্রপাত দেখতে যাচ্ছিলেন। মাঝপথে সাইকেলের টায়ার ফেঁসে গেল। সন্ধে হয় হয়। মহা বিপদ। এখন সাইকেল কাঁধে করে হেঁটে হুনড্রু যাওয়া বা রাঁচিতে ফিরে যাওয়া দুই-ই প্রায় সমান অসম্ভব। নির্জন রাস্তা। একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। দুপাশে বনজঙ্গল। বাঘের ভয় আছে। লেখক ঠিক করলেন, সাইকেল ফেলে রেখে রাঁচি ফিরে যাবেন। এখান থেকে রাঁচির দিকে যাবার গাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তাতে চড়ে। একটা লরি এল। লেখক থামাবার ইশারা করলেন, লরি থামল না। এরপর এল একটা ছোটো গাড়ি। খুব ধীর গতিতে চলছিল। লেখক মরিয়া হয়ে গাড়ির হ্যান্ডেল খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। সামনে তাকিয়ে দেখেন ড্রাইভার নেই। গাড়ির ইঞ্জিনও চলছে না। অথচ গাড়িটা ঠিক চলছে। লেখক বুঝলেন বাঘের থাবার থেকে তিনি ভূতের খপ্পরে এসে পড়েছেন। গাড়ির আরাম ছেড়ে নেমে হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছা হল না। এইভাবে ঘণ্টা দুই চলবার পর লেভেল ক্রিসং-এর সামনে এলেন। একটা ট্রেন আসছে। অথচ গাড়ি থামবার নাম নেই। তখন লেখক চলন্ত গাড়ি থেকেই নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামল আর ট্রেনটাও চলে গেল। ট্রেন চলে যেতেই গাড়ির পিছন থেকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে লেখককে বললেন যে তাঁর খারাপ গাড়িটা তিনি একাই ঠেলতে ঠেলতে এতদূর নিয়ে এসেছেন। এখন লেখক যদি তাঁকে একটু ঠেলতে সাহায্য করেন তাহলে তিনি বাড়ি পৌঁছতে পারেন। ওই সামনেই তাঁর বাড়ি।

[illegible]

টায়ার— চাকার বাইরের রবারের বেড় । এর মধ্যে হাওয়া ভরা থাকে । tyre

[illegible] — [illegible] । এখানে অর্থ tyre puncture হওয়া । টায়ারের ভিতর হাওয়া-ভরা যে রবারের টিউব থাকে তার হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া

জনমানবহীন— নির্জন, মানুষজন না থাকা

[illegible]

অনর্থক— মিছিমিছি, অকারণ

টর্চ— torchlight । [illegible] এমন আলো

[illegible]

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো

ক) 'এক ভুতুড়ে কাণ্ড' গল্পটির লেখক কে?

খ) তিনি মজা করে নিজের নামের বানান কীভাবে লিখতেন?

গ) গল্পের কোন ঘটনাটিকে লেখক 'ভুতুড়ে কাণ্ড' বলেছেন?

ঘ) যেখানে ড্রাইভারের থাকার কথা সেখানে তাকে না দেখে লেখকের অবস্থা কী হয়েছিল?

ঙ) ভূত গাড়ি চালাচ্ছে বুঝেও লেখক গাড়ি থেকে নামেননি কেন?

চ) লেভেল ক্রসিং-এ গাড়ির মালিক লেখককে কী অনুরোধ করলেন?

ছ) তাঁর গাড়ি কোথায় কতদূরে খারাপ হয়েছিল?

২. এক কথায় উত্তর দাও: পাঠ্যাংশে যা পড়েছ, তার সঙ্গে মিলিয়ে নীচের ভুলগুলো ঠিক করো

ক) যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়।

খ) সামনে গেলে সাত মাইল, ফিরতে হলে পাঁচ-।

গ) ভাবতেই আমার বুক ধুপধাপ করতে থাকে।

ঘ) আবার আমি টর্চার ঘোরাতে লাগলাম।

ঙ) গাড়ির মালিকের না হয় আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাকে তো ভদ্রতারক্ষা করতে হবে।

চ) হুঁশ হুঁশ করে ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর আমার হুশ হল।

৬. ছোটো প্রশ্ন: সংক্ষেপে উত্তর লেখো

ক) 'কোন দিকে চলিব সেই হাঁ করে ভাবছি' — এরকম ভাবনার কারণ কী?

খ) 'সেটা ঝুলিয়ে আলগোছে দোকানে নামলাম'। — কোনটি এবং কেন দোকানে নামালেন?

গ) 'যেমন এল তেমনি চলে গেল...' — কী এল? কীভাবে এল? গেলই বা কীভাবে?

ঘ) 'ভাবতেই আমার বুক দুরদুর করতে থাকে' কী ভাবনার কথা বলা হচ্ছে?

ঙ) 'বাঘ নাকি?... না বাঘ নয়' বাঘ বলে সন্দেহ হওয়ার কারণ কী? সেই সন্দেহ দূর হল কীভাবে?

চ) 'আমার দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল' — কখন ও কেন এই অবস্থার সৃষ্টি হল?

ছ) 'এক্ষুনি এই যমালয়ের যান থেকে নেমে পড়া দরকার' — কেন? 'যমালয়ের যান' কাকে বলা হয়েছে এবং কেন?

জ) 'যদি দয়া করে আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দেন, মশাই?' — কে, কাকে কখন এই অনুরোধ করেছিল?

৭. বড়ো প্রশ্ন: পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় লেখো

ক) 'এক ভুতুড়ে কাণ্ড' গল্পের বাঘের থেকে ভূতের খপ্পরে পড়ার যে অভিজ্ঞতার কথা লেখক বর্ণনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

খ) 'এক ভুতুড়ে কাণ্ড' গল্পে ভূত না থাকলেও ভূতের ভয়টা আগাগোড়া রয়ে গেছে...' — বুঝিয়ে লেখো।

গ) 'শিবরাম চক্রবর্তীর লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য "পান" বা শব্দ নিয়ে মজা করা।' — একথা কতখানি ঠিক, পঠিত গল্প থেকে অন্তত চারটি উদাহরণ দিয়ে এ-বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

ঘ) 'জিভ আমার টাকরায় আটকেছিল। কয়েক মিনিট বাদে সেখান থেকে নামলে বাকশক্তি ফিরে পেলাম।' — কখন, কোন পরিস্থিতিতে লেখকের এই অবস্থা হয়েছিল, নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখো।

ঙ) লেভেল ক্রসিং-এ পৌঁছবার পর লেখকের অবস্থা কী হয়েছিল , নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ

১. মোটা হরফের শব্দগুলোর কারক বিভক্তি নির্ণয় করো

ক) যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানে সন্ধে হয়।

খ) কাল **সকালে** উদ্ধার করা যাবে।

গ) আপনা থেকে আমার **মুখ দিয়ে** বেরিয়ে এল ।

ঘ) আমি **হাঁ করে** তাকিয়ে থাকলাম।

২. অর্থ লেখো

জনমানবহীন পাল্লা ফারাক এসপার ওসপার হুঁশ

৩. এক কথায় প্রকাশ করো

কথা বলার মতো ক্ষমতা যা এগিয়ে আসছে যিনি গাড়ি চালান এক ঘণ্টার অর্ধেক, মাটির ওপর পড়ে থাকা

তুমি কি কখনো জলপ্রপাত দেখেছ? সেটি কোথায় অবস্থিত? সেই জলপ্রপাতটির বর্ণনা নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখ।

১৭. ইঁদুরের ভোজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়ুয়ারা এই মজার গল্পটির মূল ভাবটি বুঝে, প্রশ্নের যুক্তিসম্মত উত্তর দিতে পারবে। ব্যাকরণের যে অংশগুলো তারা পড়েছে অথবা পড়ছে, তা প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারবে নিজেদের লেখায়।

কাউকে পছন্দ করা বা না-করা যার যার নিজের নিজের ব্যাপার। কিন্তু যাকে চিনি না, জানি না, দেখিনি কোনোদিন, আলাপ পরিচয়ও নেই—তাকে আগে থেকেই অপছন্দের তালিকায় রেখে বেশি চালাকি করে বাতিল করে দেওয়া নিছক বোকামি। আর এই অতি-চালাকির ফাঁদে পড়ে ক'জন ছাত্র কেমন করে নিজেরাই বোকা ব'নে গেল, তাই নিয়ে এই মজাদার গল্পটি।

ছেলেরা বললে, ভারী অন্যায়, আমরা নতুন পণ্ডিতমশাইয়ে কাছে কিছুতেই পড়ব না। নতুন পণ্ডিতমশাই যিনি আসছেন তাঁর নাম কালীকুমার তর্কালঙ্কার। ছুটির পরে ছেলেরা রেলগাড়িতে যে যার বাড়ি থেকে ফিরে আসছে ইস্কুলে। ওদের মধ্যে একজন রসিক ছেলে কালো কুমড়োর বলিদান বলে একটা ছড়া বানিয়েছে, সেইটে সকলে মিলে চিৎকার শব্দে আওড়াচ্ছে। এমন সময় আড়খোলা ইস্টেশন থেকে গাড়িতে উঠলেন একজন বুড়ো ভদ্রলোক। সঙ্গে আছে তাঁর কাঁথায় মোড়া বিছানা। ন্যাকড়া দিয়ে মুখ বন্ধ করা দু-তিনটে হাঁড়ি, একটা টিনের ট্রাঙ্ক, আর কিছু পুঁটুলি। একটা ষণ্ডা-গোছের ছেলে, তাকে ডাকে সবাই বিচকুন বলে, সে চেঁচিয়ে উঠল-এখানে জায়গা হবে না বুড়্ঢা, যাও দুসরা গাড়িতে।

বুড়ো বললেন, বড়ো ভিড়, কোথাও জায়গা নেই, আমি এই কোণটুকুতে থাকব, তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। বলে ওদের বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে নিজে এক কোণে মেঝের উপর বিছানা পেতে বসলেন।

ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তোমরা কোথা যাচ্ছ, কী করতে?

বিচকুন বলে উঠল, শ্রাদ্ধ করতে।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলেন, কার শ্রাদ্ধ?

ছেলেগুলো সব সুর করে চেঁচিয়ে উঠল—

কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কা

দেখিয়ে দেব লবডঙ্কা।

আসানসোলে গাড়ি এসে থামল, বুড়ো মানুষটি নেমে গেলেন, সেখানে স্নান করে নেবেন। স্নান সেরে গাড়িতে ফিরতেই বিচকুন বললে, এ গাড়িতে থাকবেন না মশায়।

কেন বলো তো?

ভারী ইঁদুরের উৎপাত।

ইঁদুরের? সে কী কথা।

দেখুন না আপনার ওই হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে কী কান্ড করেছিল।

ভদ্রলোক দেখলেন তাঁর যে হাঁড়িতে কদমা ছিল সে হাঁড়ি ফাঁকা, আর যেটাতে ছিল খইচুর তার একটা দানাও বাকি নেই।

বিচকুন বললে, আর আপনার ন্যাকড়াতে কী একটা বাঁধা ছিল সেটা সুদ্ধ নিয়ে দৌড় দিয়েছে।

সেটাতে ছিল ওঁর বাগানের গুটি পাঁচেক পাকা আম।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আহা, ইঁদুরের অত্যন্ত খিদে পেয়েছে দেখছি।

বিচকুন বললে, না না, ও জাতটাই ওরকম, খিদে না পেলেও খায়।

ছেলেগুলো চিৎকার করে হেসে উঠল, বললে, হাঁ মশায়, আরও থাকলে আরও খেত।

ভদ্রলোক বললেন, ভুল হয়েছে, গাড়িতে এত ইঁদুর একসঙ্গে যাবে জানলে আরও কিছু আনতুম।

এত উৎপাতেও বুড়ো রাগ করলে না দেখে ছেলেরা দমে গেল—রাগলে মজা হত।

বর্ধমানে এসে গাড়ি থামল। ঘণ্টাখানেক থামবে। অন্য লাইনে গাড়ি বদল করতে হবে। ভদ্রলোকটি বললেন, বাবা, এবারে তোমাদের কষ্ট দেব না, অন্য কামরায় জায়গা হবে।

না না, সে হবে না, আমাদের গাড়িতেই উঠতে হবে। আপনার পুঁটুলিতে যদি কিছু বাকি থাকে আমরা সবাই মিলে পাহারা দেব, কিছুই নষ্ট হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, আচ্ছা বাবা, তোমরা গাড়িতে ওঠো, আমি আসছি।

ছেলেরা তো উঠল গাড়িতে। একটু বাদেই মিঠাইওয়ালার ঠেলাগাড়ি ওদের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল, সেই সঙ্গে ভদ্রলোক।

এক-এক ঠোঙা এক-একজনের হাতে দিয়ে বললেন, এবারে ইঁদুরের ভোজে অনটন হবে না। ছেলেগুলো হুর্‌রে বলে লাফালাফি করতে লাগল। আমের ঝুড়ি নিয়ে আমওয়ালাও এল—ভোজে আমও বাদ গেল না।

ছেলেরা তাঁকে বললে, আপনি কী করতে কোথায় যাচ্ছেন বলুন।

তিনি বললেন, আমি কাজ খুঁজতে চলেছি, যেখানে কাজ পাব সেখানেই নেমে যাব।

ওরা জিজ্ঞাসা করলে, কী কাজ আপনি করেন?

তিনি বললেন, আমি টুলো পণ্ডিত, সংস্কৃত পড়াই।

ওরা সবাই হাততালি দিয়ে উঠল; বললে, তা হলে আমাদের ইস্কুলে আসুন।

তোমাদের কর্তারা আমাকে রাখবেন কেন?

রাখতেই হবে। কালো কুমড়ো টাটকা লঙ্কাকে আমরা পাড়ায় ঢুকতেই দেব না।

মুশকিলে ফেললে দেখছি। যদি সেক্রেটারিবাবু আমাকে পছন্দ না করেন?

পছন্দ করতেই হবে না করলে আমরা সবাই ইস্কুল ছেড়ে চলে যাব।

আচ্ছা বাবা, তোমরা আমাকে তবে নিয়ে চলো।

গাড়ি এসে পৌঁছল স্টেশনে। সেখানে স্বয়ং সেক্রেটারিবাবু উপস্থিত। বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে বললেন, আসুন, আসুন তর্কালঙ্কার মশায়। আপনার বাসা প্রস্তুত আছে। বলে পায়ে ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন।

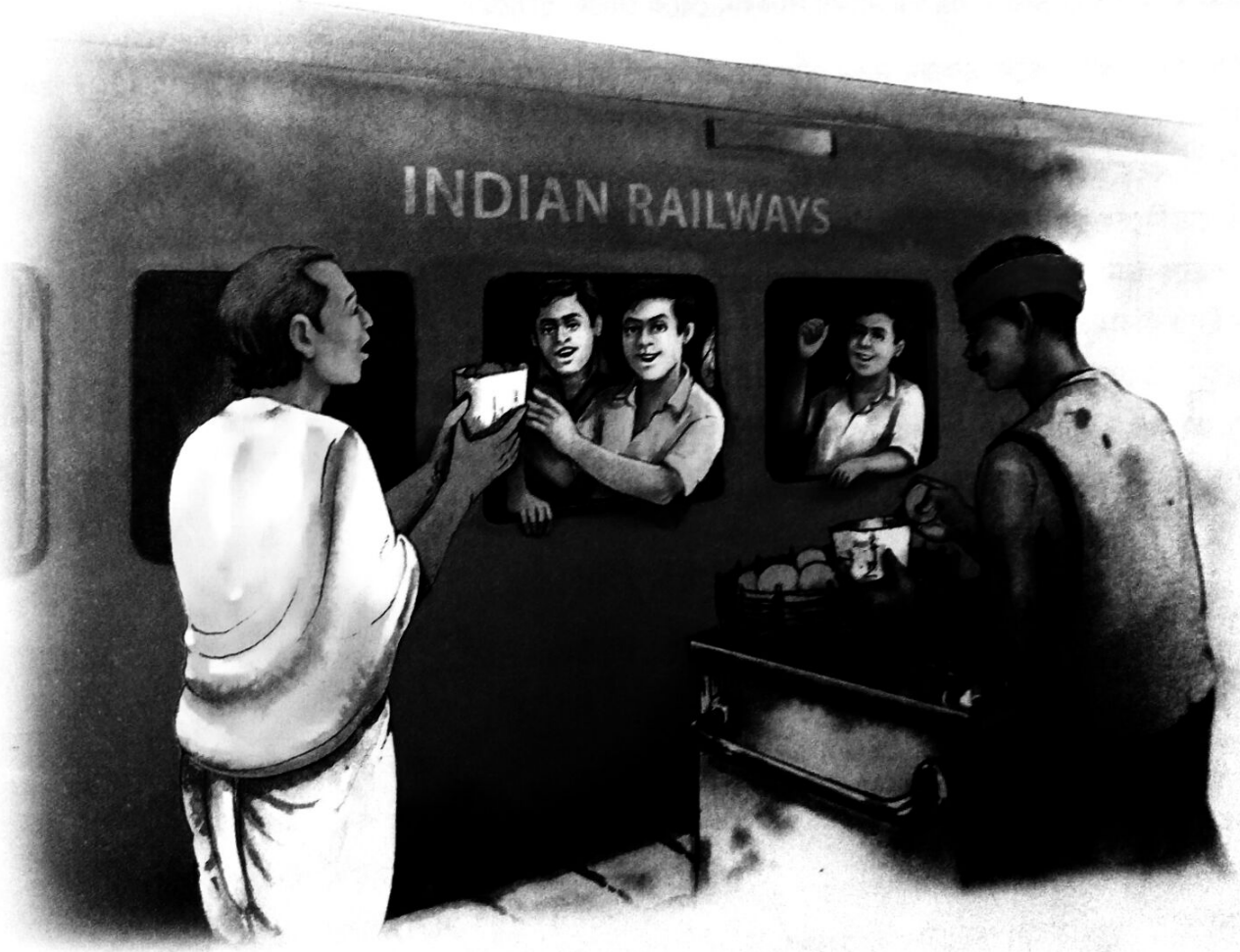

জেনে রাখো

সংক্ষেপে লেখকের কথা: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দ, কলকাতায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মা সারদা দেবী। মৃত্যু ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট। 'বড়ো' রবীন্দ্রনাথের কথা এর আগে তোমরা নানা লেখায় 'জেনে রাখো' অংশে পড়েছ। এখানে তাঁর ছেলেবেলার কথা একটু জেনে নাও তাঁরই লেখা ছেলেবেলা নামের বই থেকে।

বাড়িতে ঠাকুরমাদের আমলের একখানা পালকি ছিল। কোনো কাজে লাগত না বলে সেখানা খালি পড়ে থাকত। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত-আট। তিনি সুযোগ পেলেই ওই পালকির মধ্যে গিয়ে বসে থাকতেন। আর... 'পালকির বাইরে এক-একদিন ছিল আমার মাস্টারি। রেলিংগুলো আমার ছাত্র। ভয়ে থাকত চুপ। এক-একটা ছিল ভারী দুষ্টু, পড়াশুনোয় কিছুই মন নেই, ভয় দেখাই যে বড়ো হয়ে কুলিগিরি করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি থামতে চায় না—কেননা থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আরও একটা খেলা ছিল, সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে পুজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গিকে বলি দিয়ে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মন্তর বানাতে হয়েছিল, নইলে পুজো হয় না—

সিঙ্গিমামা কাটুম,
আন্দিবোসের বাটুম,
উলুকুট ঢুলুকুট ঢ্যামকুড়কুড়্
আখ্‌রোট বাখ্‌রোট খটখট্ খটাস্
পট্ পট্ পটাস।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালোবাসতুম। খটাস্ শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস্ শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।' 'বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে' মুদ্রিত লেখাটি মজার গল্প নামের সংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে রচনার কথা: স্কুলে একজন নতুন পণ্ডিতমশাই আসবেন। ছেলেরা ঠিক করেছে তাঁর কাছে পড়বে না। এমনকি সেই অচেনা পণ্ডিতমশাইয়ে নাম নিয়ে তারা একটা ছড়াও বানিয়ে ফেলেছে। সেই ছড়াটা বলতে বলতে ছুটির পরে তারা রেলগাড়িতে করে স্কুলে ফিরছে। এক স্টেশনে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাদের কামরায় উঠতে গেলে ছেলেদের পাণ্ডা বিচকুন তাঁকে উঠতে নিষেধ করল, এখানে জায়গা নেই বলে। ভদ্রলোক তবু উঠলেন। আসানসোলে নেমে স্নান করে কামরায় ফিরতে বিচকুন বৃদ্ধকে জানাল, এই কামরায় বড়ো ইঁদুরের উৎপাত। ওঁর হাঁড়ি আর পুঁটলি ইঁদুর লন্ডভন্ড করেছে। বৃদ্ধ মনে মনে বুঝলেন ইঁদুর কারা। এর পর গাড়ি যেখানে দাঁড়াল সেখানে গাড়ি বদল করতে হবে। বৃদ্ধ জানালেন, এবার তিনি অন্য কামরায় চলে যাবেন। ছেলেরা বাধা দিয়ে বলল, তিনি এখানেই থাকুন, তারা তাঁর জিনিস পাহারা দেবে। বৃদ্ধ ছেলেদের মিঠাই ও আম খাওয়ালেন। কথায় কথায় ছেলেরা জানতে পারল ইনি স্কুলে সংস্কৃত পড়ান। কাজের খোঁজে চলেছেন। ছেলেরা তাঁকে নিজেদের স্কুলে নিয়ে আসতে জানা গেল ইনিই তাঁদের নতুন পণ্ডিতমশাই।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

তর্কালঙ্কার—তর্কশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য দেওয়া উপাধি। তর্কশাস্ত্র = সত্য কী তা জানবার জন্য কীভাবে যুক্তিবিচার করতে হয় তার বিদ্যা। তর্ক + অলঙ্কার

রসিক—কৌতুক ও তামাশায় পটু। বিপরীত—বেরসিক, অরসিক। স্ত্রী লিঙ্গ—রসিকা

বলিদান—দেবতার উদ্দেশে পশুবধ। কুমড়োর বলিদান—একই উদ্দেশ্যে পশুর বদলে কুমড়ো বলি দেওয়া

লবডঙ্কা—ফাঁকি, কিছুই নয়। এটি একটি বাগ্‌ধারা বোধ, ঘোড়ার ডিম

কদমা—কদমফুলের মতো দেখতে চিনিতে তৈরি শক্ত মি

খইচুর—চিনির রসে পাক-দেওয়া খই, মুড়কি

একটা দানাও বাকি নেই— কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই

অত্যন্ত—খুব বেশি। অতি + অন্ত

অনটন—অভাব, কম পড়া

আওড়ানো—বারবার বলা

কাঁথা—পুরানো কাপড় আগাগোড়া সেলাই করে তৈরি এক ধরনের চাদর

পুঁটুলি—ছোটো বোঁচকা

ষণ্ডা-গোছের—ষণ্ডা = ষাঁড়ের মতো বলবান

বুড়্ঢা—বুড়ো। হিন্দি শব্দ

দুসরা—অন্য। হিন্দি শব্দ

টুলো—যিনি টোলে পড়ান। টোল = সংস্কৃত পড়ানোর পাঠশালা

সেক্রেটারিবাবু—সেক্রেটারি ইংরেজি শব্দ + বাবু হিন্দি শব্দ মিলে তৈরি। এদের বলে সংকর শব্দ বা মিশ্র শব্দ। (Secretary—গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী, সচিব

'সেক্রেটারিবাবুর' মতো আরও কয়েকটি চেনা যৌগিক শব্দ দেখে রাখো: মাস্টারমশাই— ইংরেজি মাস্টার + বাংলা মশাই কালিকলম—বাংলা কালি + আরবি কলম ভোটদাতা—ইংরেজি ভোট + সংস্কৃত দাতা ফুলদানি—বাংলা ফুল + আরবি দানি হেডপণ্ডিত—ইংরেজি হেড + সংস্কৃত পণ্ডিত রেলগাড়ি—ইংরেজি রেল + বাংলা গাড়ি

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো

ক) 'ইঁদুরের ভোজ' কার লেখা?

খ) ছেলেরা রেলগাড়ি চড়ে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল?

গ) ছেলের দলের পান্ডার নাম কি?

ঘ) নতুন পন্ডিতমশাইয়ে নাম কি?

ঙ) বৃদ্ধ ভদ্রলোক কোন স্টেশনে কামরা বদলাতে চাইলেন?

চ) বৃদ্ধ ভদ্রলোক কী করেন?

ছ) এই লেখায় ইঁদুর কারা?

জ) 'ইঁদুরের ভোজ' বলতে কাদের ভোজ বোঝানো হয়েছে?

২. এককথায় উত্তর দাও: কোনটা ঠিক? তার পাশে ✓ চিহ্ন দিয়ে দেখাও

ক) বুড়ো ভদ্রলোক যে স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠলেন তার নাম — আড়খোলা / বর্ধমান

খ) বুড়ো ভদ্রলোক যে স্টেশনে নেমে স্নান করলেন তার নাম — বর্ধমান / আসানসোল

গ) যে স্টেশনে অন্য লাইনে গাড়ি বদল হবে তার নাম — আসানসোল / বর্ধমান

ঘ) কদমা আর খইচুর ছিল — হাঁড়িতে / পুঁটুলিতে

ঙ) বাগানের আম ছিল — পুঁটুলিতে / হাঁড়িতে

চ) বৃদ্ধ ভদ্রলোক একজন — সংস্কৃত শিক্ষক / ইংরেজি শিক্ষক

৩. ছোটো প্রশ্ন: সংক্ষেপে উত্তর লেখো

ক) '... তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।'—বক্তা কে? 'তোমাদের' বলতে কাদের বোঝাচ্ছে? বক্তার একথা বলার কারণ কী?

খ) '... এ গাড়িতে থাকবেন না মশাই।'—কে বলছে? কাকে বলছে? গাড়িতে থাকতে বারণ করছে কেন?

গ) 'দেখুন না আপনার ওই হাঁড়ির মধ্যে কী কান্ড করেছিল।' —কার হাঁড়ির মধ্যে? কান্ডটাই বা কী?

ঘ) '...হাঁ মশায়, আরও থাকলে আরও খেত।' —কারা বলছে? কাকে বলছে? কী খাবার কথা বলা হয়েছে?

ঙ) '... গাড়িতে এত ইঁদুর একসঙ্গে যাবে জানলে আরও কিছু আনতুম।' —কে বলছেন? কাদের বলছেন? ইঁদুর কারা? কী আনবার কথা বলা হচ্ছে?

চ) 'আচ্ছা বাবা তোমরা আমাকে তবে নিয়ে চলো' —কে বলছেন? কাদের বলছেন? কোথায় নিয়ে যাবার কথা বলা হচ্ছে? সেখানে যাবার পর কী ঘটল?

৪. বড়ো প্রশ্ন: পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো

ক) নতুন পণ্ডিতমশাইকে জব্দ করতে গিয়ে ছেলেরা নিজেরাই কীভাবে জব্দ হল — 'ইঁদুরের ভোজ' অবলম্বনে গুছিয়ে লেখ।

খ) অপরিচিত কারও সম্পর্কে মনগড়া কোনো ধারণা করলে শেষ পর্যন্ত ঠকতে হয় — 'ইঁদুরের ভোজ' গল্প থেকে দেখাও একথা ঠিক কী না।

গ) 'ইঁদুরের ভোজ' গল্পে ছেলেদের সহযাত্রী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে তোমার কেমন লাগল বুঝিয়ে লেখো।

ঘ) গল্পে কোথাও ইঁদুর নেই তবু গল্পের নাম 'ইঁদুরের ভোজ' হল কেন?

ঙ) অল্পবয়সে দুষ্টুমি সবাই একটু-আধটু করে, বাড়াবাড়িটাই দোষের — 'ইঁদুরের ভোজ' গল্প পড়ে তোমার কি মনে হয় এ-কথা ঠিক? বুঝিয়ে লেখ।

ব্যাকরণ

১. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো

অন্যায় কালো বন্ধ অসুবিধা টাটকা পছন্দ উপস্থিত

২. নীচের মিশ্র শব্দগুলি কোন কোন শব্দ যোগ করে তৈরি হয়েছে লেখো

রেলগাড়ি হেডপণ্ডিত সেক্রেটারিবাবু ফুলদানি ভোটদাতা

৩. প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর লেখো

ক) তর্কালঙ্কার, অত্যন্ত— সন্ধিবিচ্ছেদ করো।

খ) রসিক— স্ত্রীলিঙ্গ কী?

গ) লবডঙ্কা— এরকম শব্দকে কী বলে?

ঘ) যিনি টোলে পড়ান — এককথায় লেখো।

ঙ) আওড়ানো— অর্থ লেখো।

প্রথম অধ্যায়

পূর্ণাঙ্গ ব্যঞ্জনসন্ধি

সংজ্ঞা ঃ বর্ণের সঙ্গে বর্ণের অর্থযুক্ত মিলনই সন্ধি। যেমন : হিম + আলয় = হিমালয় (অ + আ) = আ। সংস্কৃতে সন্ধি তিন প্রকার। কিন্তু খাঁটি বাংলা সন্ধি দু-প্রকার।

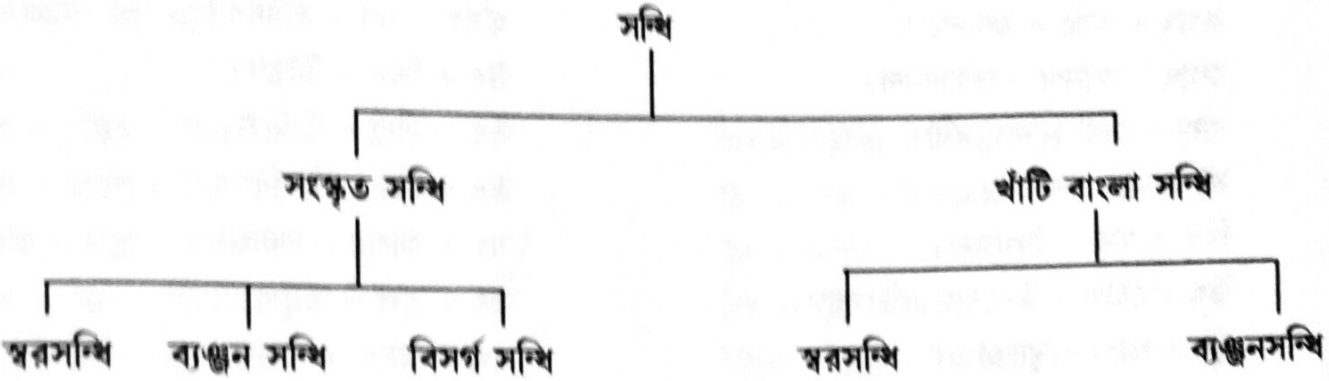

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে স্বর সন্ধি সম্বন্ধে জেনেছ। এখন সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা ব্যঞ্জন সন্ধি পড়বে।

ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

ব্যঞ্জন সন্ধি নিজস্ব রূপ প্রাপ্ত হয় তিনটি উপায়ে :

(ক) একটি বর্ণের প্রভাবে অন্য বর্ণের পরিবর্তন। যেমন : বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর।

(খ) পরস্পরের প্রভাবে উভয় বর্ণের পরিবর্তন। যেমন : উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

(গ) পরস্পররের প্রভাবে নতুন বর্ণের আগমন হয়। যেমন : ষট্ + দশ = ষোড়শ।

যেমন—

বাক্ + ময় = বাঙ্ময়	[ক্ + ম্ = ঙ্ম]
চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র	[ত্ + চ্ = চ্চ]
জগৎ + নাথ = জগন্নাথ	[ত্ + ন্ = ন্ন]
ষট্ + আনন = ষড়ানন	[ট্ + আ = ড়া]

প্রথম উদাহরণে ব্যঞ্জন বর্ণ (ক + ম) মিলে [ঙম] হয়েছে, দ্বিতীয় উদাহরণে (ত + চ) মিলে [চ্চ] হয়েছে, তৃতীয় উদাহরণে (ত্ + ন) মিলে [ন্ন] হয়েছে, এবং চতুর্থ উদাহরণে (ট্ + আ) মিলে [ড়া] হয়েছে।

■ নিচে ব্যঞ্জন সন্ধির সূত্রসহ উদাহরণ দেওয়া হল লক্ষ করো।

সূত্র ১ ঃ স্বরবর্ণ পরে থাকলে বর্গের প্রথম বর্ণ তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয়।

যেমন—

দিক্ + অঙ্গনা = দিগঙ্গনা।
বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর।
ঋক্ + বেদ = ঋগ্‌বেদ।
বাক্ + ঈশ = বাগীশ।
নিচ্ + অন্ত = নিজন্ত।
প্রাক্ + উক্ত = প্রাগুক্ত।
তদ্ + অন্ত = তদন্ত।
সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত।

দিক্ + বিজয়ী = দিগ্‌বিজয়ী।
বাক্ + ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী
পৃথক + অন্ন = পৃথগন্ন

ষট্ + ঋতু = ষড়্‌ঋতু।
ষট্ + ঐশ্বর্য = ষড়্‌ঐশ্বর্য।
ষট্ + অক্ষর = ষড়্‌ক্ষর।

সূত্র ২ ঃ আগে বর্গের প্রথম বর্ণ এবং পরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ বা য, র, ল, ব থাকলে, প্রথম বর্ণ বর্গের তৃতীয় বর্ণে পরিণত হয়।

যেমন—

বাক্ + দান = বাগ্‌দান।
জগৎ + অম্বা = জগদম্বা।
জগৎ + আনন্দ = জগদানন্দ।
বাক্ + দেবী = বাগ্‌দেবী।
ষট্ + যন্ত্র = ষড়্‌যন্ত্র।
দিক্ + গজ = দিগ্‌গজ।
উৎ + যোগ = উদ্‌যোগ / উদ্যোগ।
মৃৎ + ভাণ্ড = মৃদ্‌ভাণ্ড।
কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত।
বিদ্যুৎ + অগ্নি = বিদ্যুদগ্নি।
দিক্ + ভ্রম = দিগ্‌ভ্রম।
উৎ + ঘাটন = উদ্‌ঘাটন।
বৃহৎ + রথ = বৃহদ্রথ।
অপ্ + জ = অব্জ।
প্রাক্ + বিশ্ববিদ্যালয় = প্রাগ্‌বিশ্ববিদ্যালয়

সৎ + বংশীয় = সদ্‌বংশীয়।
হরিৎ + বর্ণ = হরিদ্‌বর্ণ।
উৎ + ভিদ = উদ্ভিদ্।
উৎ + দীপ্ত = উদ্দীপ্ত।
উৎ + বিগ্ন = উদ্‌বিগ্ন।
সৎ + আশয় = সদাশয়।
তৎ + রূপ = তদ্রূপ।
সৎ + অসৎ = সদসৎ।
মৃৎ + গর্ভ = মৃদ্‌গর্ভ।
জগৎ + ধাত্রী = জগদ্ধাত্রী।
পশ্চাৎ + আগত = পশ্চাদাগত।
বিদ্যুৎ + বেগে = বিদ্যুদ্‌বেগে।
হৃৎ + আকাশ = হৃদাকাশ।
জগৎ + অতীত = জগদতীত।
উদ্ + যম = উদ্যম।

সূত্র -৩ ঃ আগে বর্গের প্রথম বর্ণ এবং পরে বর্গের পঞ্চম বর্ণ থাকলে প্রথম বর্ণ স্থানে ওই বর্গের তৃতীয় বা পঞ্চম বর্ণ হয়ে থাকে।

যেমন—

ষট্ + মাস = ষড়্‌মাস/ ষন্মাস
তৎ+ মধ্য = তদ্‌মধ্য / তন্মধ্য
দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্‌নির্ণয়

জগৎ + নাথ = জগদ্‌নাথ / জগন্নাথ।
দিক্ + নাগ = দিগ্‌নাগ / দিঙ্‌নাগ।

সূত্র ৪ ঃ ত্-এর পরে হ থাকলে 'ত্' স্থানে দ্ এবং 'হ' এর স্থানে ধ্ হয়।

যেমন—

উৎ + হত = উদ্ধত
পৎ + হতি = পদ্ধতি
উৎ + হার = উদ্ধার

উৎ + হৃত = উদ্ধৃত।
তৎ + হিত = তদ্ধিত।
জগৎ + হিত = জগদ্ধিত।

সূত্র ৫ ঃ বর্গের প্রথম বর্ণ অর্থাৎ, ক্, চ্, ট্, ত্, প্ এর পর 'ন্' বা 'ম্' থাকলে ওই প্রথম বর্ণের স্থানে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

উৎ + নতি = উন্নতি।
উৎ + নিমীলিত = উন্মীলিত।
বিপদ + মুক্ত = বিপন্মুক্ত।

দিক্ + মণ্ডল = দিঙ্‌মণ্ডল।
উৎ + মেষ = উন্মেষ।
জগৎ + মাতা = জগন্মাতা।

জগৎ + নাথ = জগন্নাথ
মৃৎ + ময় = মৃন্ময়।
বাক্ + ময় = বাঙ্ময়
চিৎ + ময় = চিন্ময়
তৎ + মাত্র = তন্মাত্র
ক্ষুৎ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি
তদ্ + ময় = তন্ময়।
উৎ + নাসিক = উন্নাসিক।
সম্পদ্ + ন = সম্পন্ন।
ছিদ্ + ন = ছিন্ন।
ষট্ + মাস = ষণ্মাস।
কিঞ্চিৎ + মাত্র = কিঞ্চিন্মাত্র।

সূত্র ৬ ঃ চ বা ছ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত ও দ স্থানে 'চ' হয়। অর্থাৎ 'চ' থাকলে 'চ্চ' হয় এবং 'ছ' থাকলে 'চ্ছ' হয়।

যেমন—
সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র।
উৎ + চারণ = উচ্চারণ
চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র।
উৎ + ছিন্ন = উচ্ছিন্ন।
তদ্ + ছবি = তচ্ছবি।
অসৎ + চিন্তা = অসচ্চিন্তা।
সৎ + চিদানন্দ = সচ্চিদানন্দ।
বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা।
উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
উৎ + চকিত = উচ্চকিত।
উৎ + ছল = উচ্ছল।
বিপদ্ + ছায়া = বিপচ্ছায়া।
বিদ্যুৎ + চমক = বিদ্যুচ্চমক।
উদ্ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল।

সূত্র-৭ ঃ ত ও দ এর পর জ বা ঝ থাকলে ত ও দ স্থানে 'জ' হয়।

যেমন—
যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন।
উৎ + জীবিত = উজ্জীবিত।
জগৎ + জন = জগজ্জন।
তৎ + জন্য = তজ্জন্য।
বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল।
উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল।
অসৎ + জন = অসজ্জন।
জগৎ + জননী = জগজ্জননী।
জগৎ + জীবন = জগজ্জীবন।
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।
সৎ + জন = সজ্জন।
বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক।
বিদ্বৎ + জন = বিদ্বজ্জন।

সূত্র-৮ ঃ ত কিংবা দ এর পর ট বা ঠ থাকলে ত এবং দ এর স্থানে 'ট' (ট বর্গে পরিণত) হয়। 'ট'পরের ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়।

যেমন—
বৃহৎ + টংকার = বৃহট্টংকার।
বৃহৎ + টীকা = বৃহট্টীকা।
তদ্ + টীকা = তট্টীকা।
বৃহৎ + ডম্বরু = বৃহড্ডম্বরু।
তদ্ + ঠাকুর = তট্ঠাকুর।
উৎ + ডীন = উড্ডীন।
তদ্ + ঢক্কা = তড্ঢক্কা।

সূত্র -৯ ঃ ত এর পরে 'ল' থাকে তবে ত স্থানে 'ল' হয়।

যেমন—
বিদ্যুৎ + লতা = বিদ্যুল্লতা।
উৎ + লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন।
তৎ + লিপি = তল্লিপি।
উৎ + লাস = উল্লাস।
উৎ + লম্ফ = উল্লম্ফ।
তৎ + লিখিত = তল্লিখিত।

উৎ + লেখ = উল্লেখ।

উৎ + লম্ফন = উল্লম্ফন।

উৎ + লিখিত = উল্লিখিত।

উৎ + লসিত = উল্লসিত।

সূত্র -১০ ঃ ম্ এর পরে য, র, ল, ব, হ, শ, ষ, স থাকলে ম স্থানে 'ঙ' বা 'ং' হয়।

যেমন—

প্রিয়ম্ + বদা = প্রিয়ংবদা

সম্ + হতি = সংহতি

সম্ + গীত = সংগীত

কিম্ + বদন্তী = কিংবদন্তী।

সম্ + সার = সংসার।

সম্ + লীন = সংলীন।

সম্ + যত = সংযত।

সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ।

সম্ + বিৎ = সংবিৎ।

স্বয়ম্ + বরা = স্বয়ংবরা।

কিম্ + বা = কিংবা।

বশম্ + বদ = বশংবদ।

সম্ + বলিত = সংবলিত।

সম্ + বরণ = সংবরণ।

অহম্ + কার = অহংকার।

সম্ + বিধান = সংবিধান।

সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন।

সম্ + হার = সংহার।

সম্ + বাদ = সংবাদ।

সম্ + শয় = সংশয়।

সূত্র -১১ ঃ স্বরবর্ণের পরে 'ছ' থাকে 'ছ' স্থানে 'চ্ছ' হয়।

যেমন —

বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া।

পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন।

পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন।

গৃহ + ছিদ্র = গৃহচ্ছিদ্র।

এক + ছত্র = একচ্ছত্র।

তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া।

পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ।

হেম + ছত্র = হেমচ্ছত্র।

বি + ছেদ = বিচ্ছেদ।

সুবর্ণ + ছবি = সুবর্ণচ্ছবি।

বর্ণ + ছত্র = বর্ণচ্ছত্র।

আ + ছাদিত = আচ্ছাদিত।

স + ছিদ্র = সচ্ছিদ্র।

আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন।

মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি।

গৃহ + ছবি = গৃহচ্ছবি।

মধু + ছন্দা = মধুচ্ছন্দা।

স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ।

সূত্র -১২ ঃ ত্ বা দ্ এর পরে 'শ' থাকলে ত্-দ্ স্থানে 'চ্' এবং শ্ স্থানে 'ছ্' হয়।

যেমন—

উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল।

উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি।

উৎ + শ্বসিয়া = উচ্ছ্বসিয়া।

সূত্র -১৩ ঃ চ্ থেকে ম্ পর্যন্ত যে কোনো বর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তেস্থিত 'ম্' এর জায়গায় যে বর্গের বর্ণ থাকে তার স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

যেমন—

সম্ + দেশ = সন্দেশ।

বসুম্ + ধরা = বসুন্ধরা।

সম্ + নিহিত = সন্নিহিত।

সম্ + তাপ = সন্তাপ।

পরম্ + তপ = পরন্তপ

নিয়ম্ + তা = নিয়ন্তা।

সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ।

সম্ + বল = সম্বল।

সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ।
সম্ + চিত = সঞ্চিত।
সম্ + ধান = সন্ধান।
সম্ + মান = সম্মান।
সম্ + মতি = সম্মতি।
সম্ + চয় = সঞ্চয়।
মৃত্যুম্ + জয় = মৃত্যুঞ্জয়।
সম্ + ত্রস্ত = সন্ত্রস্ত।
সম্ + বোধন = সম্বোধন।
সম্ + ধি = সন্ধি।
শাম্ + তি = শান্তি।
কিম্ + তু = কিন্তু।
সম্ + ন্যাসী = সন্ন্যাসী।
গম্ + তব্য = গন্তব্য।
কিম্ + নর = কিন্নর।
ক্ষাম্ + ত = ক্ষান্ত।

সূত্র-১৪ ঃ 'ষ্' এর পর ত্ থাকলে 'ত্'-এর জায়গায় হয় 'ট্' আর 'থ্' থাকলে 'থ্' এর স্থানে হয় 'ঠ্'।

যেমন—

উৎকৃষ্ + ত্ = উৎকৃষ্ট।
ষষ্ + থ্ = ষষ্ঠ।
বৃষ্ + তি = বৃষ্টি।
কৃষ্ + তি = কৃষ্টি।
হৃষ্ + ত্ = হৃষ্ট।
ইষ্ + তি = ইষ্টি।
ইষ্ + ত্ = ইষ্ট।
ইষ্ + তক = ইষ্টক।

সূত্র -১৫ ঃ সম্ ও পরি উপসর্গের পরে কৃ ধাতু থাকলে সেই ধাতুর আগে একটি অতিরিক্ত 'স্/ ষ্' আসে আর য়-এর জায়গায় 'ং' হয়।

যেমন—

সম্ + কৃত = সংস্কৃত।
সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি।
পরি + কৃত = পরিষ্কৃত।
সম্ + কারক = সংস্কারক।
পরি+ কার = পরিষ্কার।
পরি + করণ = পরিস্করণ।

সূত্র-১৬ ঃ উদ্ উপসর্গের পরে স্থা ও স্তম্ভ ধাতুর স্ লোপ পায়।

যেমন—

উৎ + স্থিত = উত্থিত।
উৎ + স্তম্ভ = উত্থম্ভ।
উৎ + স্থান = উত্থান।
উৎ + স্থাপন = উত্থাপন।

সূত্র-১৭ ঃ ন্ এর পর শ্, ষ্, স্ থাকলে ন্ এর স্থানে 'ং' হয়।

যেমন—

দন্ + শন্ = দংশন।
প্রশন্ + সা = প্রশংসা।
জিঘান্ + সা = জিঘাংসা।
হিন্ + সা = হিংসা।
বৃন্ + হিত = বৃংহিত।
মীমান্ + সা = মীমাংসা।

সূত্র-১৮ ঃ দ্ বা ধ্ পর যদি 'ন্' বা 'ম্' থাকে, তবে 'দ্' ও 'ধ্' স্থানে ন্ হয়।

যেমন—

উদ্ + নতি = উন্নতি।
ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি।
বিপদ্ + মুক্ত = বিপন্মুক্ত।
তদ্ + নিমিত্ত = তন্নিমিত্ত
চিদ্ + ময়ী = চিন্ময়ী।
হৃদ্ + মম = হৃন্মম।
তদ্ + ময় = তন্ময়।
তদ্ + মধ্যে = তন্মধ্যে।

সূত্র - ১১ : পদের অন্তেস্থিত চ্ বা জ্ এর পর ন্ থাকলে ন স্থানে ঞ হয়।

যেমন—

রাচ্ + না = যাচ্ঞা

যজ্ + ন = যজ্ঞ।

রাজ্ + নী = রাজ্ঞী।

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি

■ ব্যঞ্জন সন্ধির প্রচলিত সূত্রগুলিকে না মেনে যে ব্যঞ্জন সন্ধি হয় তাকে নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

যেমন—

হরি + চন্দ = হরিশ্চন্দ্র।

আ + পদ = আস্পদ।

অহ + নিশ্ = অহর্নিশ।

এক + দশ = একাদশ।

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি।

পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি।

তৎ + কর = তস্কর।

মনস্ + ঈষা = মনীষা।

পর + পর = পরস্পর।

দিব্ + লোক = দ্যুলোক।

পুনঃ + লিপ্সা = পুনর্লিপ্সা।

ত্রিদশ + অ = সিদ্ধ।

পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ।

বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র।

প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত।

গো + পদ = গোষ্পদ।

বন + পতি = বনস্পতি।

আ + চর্য = আশ্চর্য।

ষট্ + দশ = ষোড়শ।

■ এছাড়াও কিছু ব্যঞ্জন সন্ধির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এগুলি আলোচিত সূত্রগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে ব্যঞ্জনসন্ধির স্বরূপ উপলব্ধি আরও সহজ হবে—

দিক্ + নির্ণয় = দিঙনির্ণয়।

সম্ + চয় = সঞ্চয়।

পরম্ + তু = পরন্তু।

সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত

এতদ্ + মাত্র = এতন্মাত্র

নিচ্ + অন্ত = নিজন্ত।

অপ্ + ধি = অবধি / অব্ধি।

ভরত্ + বাজ = ভরদ্বাজ।

সৃষ্ + তি = সৃষ্টি।

ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু।

প্রাক্ + জ্যোতিষ = প্রাগজ্যোতিষ

বিমুহ্ + ত = বিমুগ্ধ।

দুহ্ + ত = দুগ্ধ

বুধ্ + ত = বুদ্ধ

চিৎ + সম্পদ = চিৎসম্পদ।

উৎ + ডীন = উড্ডীন।

বিদ্বৎ + জন = বিদ্বজ্জন।

কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি।

সম্ + কেত = সংকেত।

অহম্ + কার = অহংকার।

সম্ + ঘাত = সংঘাত।

কিম্ + ভূত = কিম্ভূত।

কিম্ + তু = কিন্তু।

জগৎ + হিত = জগদ্ধিত।

বিপদ্ + হেতু = বিপদ্ধেতু।

সম্ + হতি = সংহতি।

তৎ + শোণিত = তচ্ছোণিত।

তৎ + নিমিত্ত = তন্নিমিত্ত।

উৎ + জীবিত = উজ্জীবিত।

কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত।

শরৎ + ইন্দু = শরদিন্দু।

ভগবৎ + গীতা = ভগবদ্গীতা।

সম্ + গোপন = সংগোপন।

পরাক্ + মুখ = পরাঙ্মুখ।

বট্ + ছায়া = বটচ্ছায়া।
বি + ছেদ = বিচ্ছেদ।
বিপদ্ + চয় = বিপচ্চয়।
মহৎ + চক্কা = মহচ্চক্কা।
তৎ + ত্ব = তত্ত্ব।
জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু।
দৃশ্ + তি = দৃষ্টি।
উদ্ + যম = উদ্যম।
ষট্ + নবতি = ষন্নবতি।
বাক্ + নিষ্ঠ = বাঙ্নিষ্ঠ।
মধু + ছন্দা = মধুচ্ছন্দা।
বর্ণ + ছত্র = বর্ণচ্ছত্র।
সুবর্ণ + ছবি = সুবর্ণচ্ছবি।
বুধ্ + ত্ = বুদ্ধ।
লভ্ + ত্ = লব্ধ।
তদ্ + লিপি = তল্লিপি।

অনুশীলনী

১। **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

শরৎচন্দ্র, উচ্চকিত, বিদ্বজ্জন, উজ্জীবিত, তট্টীকা, চিদ্‌সম্পদ, চলচ্ছক্তি, উচ্ছ্বসিত, জগদ্ধিত, বিমুগ্ধ, সুবর্ণচ্ছবি, রাজ্ঞী, দিঙ্‌নিরূপণ, বাঙ্‌নিষ্পত্তি, পরাঙ্মুখ, জিঘাংসা, সন্ন্যাসী, বসুন্ধরা, সন্নিহিত, বিশ্বামিত্র, উৎকৃষ্ট, দ্যুলোক, মনীষা, বৃহস্পতি, পতঞ্জলি, প্রৌঢ়, ষড়বিঘ্ন, ষড়ানন, বাগিন্দ্রিয়, ষড়দর্শন, দিগ্‌ভ্রম, উদ্‌যোগ, কৃদন্ত, বিদ্যুদগ্নি।

২। **সন্ধি করো :**

শম্ + করী, সম্ + গোপন, মৃত্যুম্ + জয়ী, কিম্ + নর, সম্ + মতি, প্রশন্ + সা, মৃৎ + ময়, দিক্ + নিরূপণ, রাজ + নী, পরি + ছন্ন, আ + চর্য, গো + পদ, হিন্‌স্ + অ, বৃহৎ + পতি, পর + পর, স্বয়ম্ + বরা, কিম্ + বদন্তি।

৩। **বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরের পাশে (✓) চিহ্ন দাও :**

(i) দিক্ + বলয় = দিগ্বলয় ( ), দিঙ্‌বলয় ( )।
(ii) নিচ্ + অন্ত = নিচন্ত ( ), নিজন্ত ( )।
(iii) পৃথক + অন্ন = পৃথকন্ন ( ), পৃথগন্ন ( )।
(iv) সৎ + ছন্দ = সচ্ছন্দ ( ), স্বাচ্ছন্দ ( )।
(v) মৃৎ + অঙ্গা = মৃদঙ্গা ( ), মৃতঙ্গা ( )।

৪। **নিম্নরেখ পদগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ করে লেখো :**

(i) প্রাচীনতম বেদ হল ঋগ্বেদ।
(ii) সব সমস্যার মীমাংসা এভাবে হবে না।
(iii) অপরাধীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে।
(iv) দেশের উন্নয়ন মানুষের ওপরই নির্ভরশীল।
(v) বিপৎকালে সত্যিকার বন্ধু চেনা যায়।

৫। **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

(i) সম্ + ——— = সন্তাপ।
(ii) ষট্ + ঐশ্বর্য = ——— ।
(iii) সৎ + জন = ——— ।
(iv) সৎ + ——— = সদ্বংশ।
(v) বৃহৎ + রথ = ——— ।

৬। **ঠিক উত্তরটি বেছে নাও :**

বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র / বিশ্বমিত্র।
ষট্ + দশ = ষষ্টদশ / ষোড়শ।
পৃথক + অন্ন = পৃথগন্ন / পৃথকন্ন।
তৎ + শোণিত = তৎশোণিত / তৎশোনিত।
আ + চর্য = আশ্চর্য / আর্চয।
বন + পতি = বনস্পতি / বনপতি।
সম + বোধন = সমবোধন / সম্বোধন।
মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ / মাতৃাদেশ।
বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি / বৃহৎপতি।
হরি + চন্দ্র = হরিঃচন্দ্র / হরিশ্চন্দ্র।
পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জুলি / পতঞ্জলি।
দিব্ + লোক = দ্যুলোক / দিব্লোক।

৭। **সূত্র উল্লেখ করে সন্ধি বিচ্ছেদ করো :**

চলচ্চিত্র, পরিচ্ছেদ, বাঙ্ময়, সন্ন্যাসী, উচ্ছ্বাস, ব্যুৎপত্তি, দিঙ্নাগ, পতঞ্জলি, পরিষ্কার, প্রিয়ম্বদা, ক্ষুৎপিপাসা।

৮। **আলোচ্য অনুচ্ছেদ থেকে সন্ধিবদ্ধ পদগুলি বার করে সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ**

ঘরের বাইরে উন্মুক্ত প্রকৃতিতে চলেছে জলবৃষ্টির দাপাদাপি। যেন দুই দাঁতাল হাতির সংগ্রাম। প্রথম দাবদাহের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কিঞ্চিৎ ঠান্ডার সম্পর্ক মনের মধ্যে শান্তি এনেছে। তাই বৃষ্টি ও ঝড়ের মধ্যে যেন কাব্য কবিতার মাধুর্য খুঁজে পেলাম। রাত্রির অন্ধকার আর অন্ধকারের রহস্য আমার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলল।

৯। **সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।**

১০। **ব্যঞ্জন সন্ধি কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো।**

১১। **নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

১২। 'ক' বর্গের সঙ্গে 'খ' বর্গের সমন্বয় করো।

বৃহস্পতি	দিব্ + লোক।
হরিশ্চন্দ্র	পর + পর।
বনস্পতি	ষট্ + দশ।
দ্যুলোক	পতৎ + অঞ্জলি।
পরস্পর	বৃহৎ + পতি।
ষোড়শ	হরি + চন্দ্র।
পতঞ্জলি	বন + পতি।
এদম্মাত্র	দিক্ + নির্ণয়।
দিঙ্নির্ণয়	এতদ্ + মাত্র।

দশম অধ্যায়

(ক) বিপরীতার্থক শব্দ ও (খ) প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

বিপরীতার্থক শব্দ

যখন কোনো শব্দ অন্য কোনো শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে বিপরীতার্থক শব্দ বলা হয়।

নীচে কতকগুলি বিপরীতার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল।

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অখ্যাতি	সুখ্যাতি
অন্তর	বাহির
আনন্দ	দুঃখ
আগে	পরে
আপন	পর
একাল	সেকাল
উষ্ণ	শীতল
এপার	ওপার
কৃশ	স্থূল
কম	বেশি
ধনী	নির্ধন / দরিদ্র
দাবি	মঞ্জুর
দুরন্ত	শান্ত
দুর্গম	সুগম
দেনা	পাওনা
আলো	অন্ধকার
আয়	ব্যয়
আরম্ভ	শেষ
অবিচার	সুবিচার
সদাচার	অনাচার / কদাচার
অলস	পরিশ্রমী
ইচ্ছা	অনিচ্ছা
উত্তম	অধম
উঁচু	নীচু
ইহজন্ম	পরজন্ম
ঋজু	বক্র

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অচল	সচল
অজ্ঞ	বিজ্ঞ
আগা	গোড়া
অল্প	অধিক
আসল	নকল
ওঠা	বসা
উপকার	অপকার
কাছে	দূরে
কর্কশ	মসৃণ
কাঁচা	পাকা
তাল	বেতাল
দখল	বেদখল
দুঃখ	সুখ
দাতা	গ্রহীতা
নিন্দা	স্তুতি
আশা	নিরাশা
অগ্র	পশ্চাৎ
আমিষ	নিরামিষ
আবাহন	বিসর্জন
আকর্ষণ	বিকর্ষণ
আকাশ	পাতাল
উপস্থিত	অনুপস্থিত
ইতর	ভদ্র
উদয়	অস্ত
ঐক্য	অনৈক্য
এদিন	সেদিন

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
তপ্ত	শীতল
উৎকৃষ্ট	নিকৃষ্ট / অপকৃষ্ট
অশন	অনশন
নিরাকার	সাকার
বিষন্ন	প্রসন্ন
স্থাবর	জঙ্গম
দ্যুলোক	ভূলোক
কঠিন	কোমল
গুপ্ত	প্রকাশিত
গৃহী	সন্ন্যাসী
টাটকা	বাসি
গুণ	দোষ
জয়	পরাজয়
চেনা	অচেনা
ছোটো	বড়ো
চড়াই	উৎরাই
জীবিত	মৃত
চিরকাল	ক্ষণকাল
জমা	খরচ
কুখ্যাত	সুখ্যাত
অহিংস	সহিংস
মুখ্য	গৌণ
বিপথ	সুপথ
সার্থক	নিরর্থক
তাপ	শৈত্য
ন্যায়	অন্যায়
পাপ	পূণ্য
শান্ত	অশান্ত
ভালো	মন্দ
মোটা	রোগা
মিল	গরমিল
প্রবীণ	নবীন
পয়া	অপয়া
বাঁকা	সোজা
হর্ষ	বিষাদ
সুর	অসুর
সুলভ	দুর্লভ

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
লঘু	গুরু
অসীম	সসীম
লাভ	লোকসান
বন্ধুর	মসৃণ
হরণ	পূরণ
তরুণ	বৃদ্ধ
আসামি	ফরিয়াদি
খাদ	নিখাদ
গ্রহণ	বর্জন
গরম	ঠাণ্ডা
জানা	অজানা
জন্ম	মৃত্যু
যাওয়া	আসা
চোর	সাধু
চালাক	বোকা
জটিল	সরল
জড়	জীব
জোড়	বিজোড়
তিরস্কার	পুরস্কার
আরব্ধ	সমাপ্ত
অর্পণ	গ্রহণ
নিরত	বিরত
মৃদু	গভীর
নন্দিত	নিন্দিত
অবনত	উন্নত
পণ্ডিত	মুর্খ
পূর্ণ	শূন্য
বোকা	চালাক
ভীতু	সাহসী
মান	অপমান
বিধি	নিষেধ
বাঁচা	মরা
পথ্য	অপথ্য
বিষ	অমৃত
হিত	অহিত
সাধু	অসাধু
পুরুষ	নারী

(ক) বিপরীতার্থক শব্দ

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
উন্নত	বিনত	আবৃত	অনাবৃত
উর্বর	উষর	উদার	অনুদার
প্রশ্বাস	নিঃশ্বাস	নির্দয়	সদয়
সরস	নীরস	সুগম	দুর্গম
নজির	বেনজির	সবাক	নির্বাক
ত্যাজ্য	গ্রাহ্য	জোয়ার	ভাটা
হাল	বেহাল		

অনুশীলনী

১। **বিপরীতার্থক শব্দ কাকে বলে? পাঁচটি উদাহরণ দাও।**

২। **বিপরীত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।**

(i) অর্থই ————মূল।
(ii) ভালো ———— নিয়েই জীবন।
(iii) সুখ ———— নিয়ে এই পৃথিবী বেশ ভালো।
(iv) জীবন ———— পায়ে ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।
(v) অসহ্য গরম আর ———— করা যায় না।
(vi) ভালো লোকেদের কুখ্যাতি ———— দুই-ই আছে।
(vii) জীবনের চড়াই ———— মাড়িয়ে সকলেই চলতে হয়।
(viii) উচ্চ ———— ভেদাভেদ সমাজে না থাকাই ভালো।
(ix) রাত ———— ঝগড়া আর ভালো লাগে না।
(x) আসা ———— পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছি।
(xi) জয় ———— আমাদের হাসায় ————।
(xii) জীবনে তো হার ———— আছেই।
(xiii) দুরকে করিলে ———— বন্ধু।
(xiv) সত্য———— বিচার করার শক্তি সকলের থাকে না।
(xv) কাঁচা ———— দাড়ি নিয়ে মামা ঘরে ঢুকলেন।

৩। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**
জমা, অবিচার, হ্রাস, টাটকা, সম্মুখ, নাস্তিক, বিষ, প্রবাসী, জটিল, জীবন, কঠিন, ঋজু, উদয়, কর্কশ, অজ্ঞ, আনন্দ, আদান, অগ্র, সত্য, সুখ, গাঢ়, ভীতু, ধ্বংস, শহর, উপস্থিত, ইচ্ছা, সুন্দর, চড়াই আগা।

৪। **ঠিক বিপরীত শব্দটির নীচে দাগ দাও :**

(i) দ্যুলোক—(গোলোক / ভূলোক)
(ii) উদয়—(অস্ত / সন্ধ্যা)
(iii) ঋজু—(বক্র / অর্বাচীন)
(iv) তপ্ত—(শীতল / গরম)
(v) তরুণ—(বৃদ্ধ / অর্বাচীন)

(খ) প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যাদের উচ্চারণের মধ্যে পার্থক্য প্রায় নেই বললেই হয়— অথচ অর্থ স আলাদা। বাংলা ভাষায় এইসব শব্দই **প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ** নামে পরিচিত।

নীচে এরকম কিছু শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল :

অংশ	ভাগ
অংস	কাঁধ
অশ্ব	ঘোড়া
অশ্ম	প্রস্তর
অণু	ক্ষুদ্রতম অংশ
অনু	পশ্চাৎ
অর্ঘ	মূল্য
অর্ঘ্য	পূজার উপাচার
অসিত	কালো
অশিত	ভক্ষিত
অখ্যাত	খ্যাতিহীন
আখ্যাত	কথিত
আপণ	দোকান
আপন	নিজের
আসার	জলকণা
আষাঢ়	মাস বিশেষ
অন্য	অপর
অন্ন	খাদ্য
উপাদান	উপকরণ
উপাধান	বালিশ
কপোত	পায়রা
খপোত	উড়োজাহাজ
কুল	বংশ
কূল	নদীর তীর
কুজন	মন্দলোক
কূজন	কাকলি
চাষ	আবাদ
চাস	নীলকণ্ঠ পাখি
বাণ	শর
বান	বন্যা
মূক	বোবা
মুখ	বদন
মুখ্য	প্রধান
মূর্খ	বোকা
শিকার	মৃগয়া
স্বীকার	সম্মতি
সুত	পুত্র
সূত	সারথি
সাক্ষর	অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন
স্বাক্ষর	সই
কমল	পদ্ম
কোমল	নরম
কুঁড়ি	মুকুল
কুড়ি	বিশ
কপাল	ললাট
কপোল	গাল
গোলক	গোলবস্তু
গোলোক	স্বর্গ
গিরিশ	মহাদেব
গিরীশ	হিমালয়
চির	দীর্ঘকাল
চীর	জীর্ণ
চ্যুত	আম্র
চ্যুত	পতিত
তদ্বীয়	তার
ত্বদীয়	তোমার
দিন	দিবস
দীন	দরিদ্র
দ্যূত	পাশাখেলা
দূত	চর
দীপ	প্রদীপ
দ্বীপ	চারিদিকে জল বেষ্টিত স্থলভাগ
দ্বিপ	হাতি

ধ্বনি	শব্দ
ধনি	রমণী
ধনী	বড়োলোক
শর	তীর
সর	দুধের সর
ধূম	ধোঁওয়া
ধুম	সমারোহ
টিকা	তিলক
টীকা	শব্দার্থ ব্যাখ্যা
জালা	জল রাখার পাত্র
জ্বালা	যন্ত্রণা
সিত	সাদা
শীত	ঋতু/ ঠান্ডা
শম	শান্তি
সম	সমান
হাঁস	হংস
হাস	হাসি
নিতি	প্রবাহ/ নিত্য
নীতি	বিধান/ নিয়ম
প্রসাদ	অনুগ্রহ
প্রাসাদ	অট্টালিকা
পাণি	হাত
পানি	জল
পাকা	পক্ক/ দক্ষ
পাখা	ডানা
পদ্ম	ফুলবিশেষ
পদ্য	কবিতা
বলি	উৎসর্গ
বলী	বলবান
বিনা	ব্যতীত
বীণা	বাদ্যযন্ত্র
নীড়	পাখির বাসা
নীর	জল
প্রকার	রকম
প্রাকার	প্রাচীর
স্বর্গ	দেবলোক
সর্গ	কাব্যের অধ্যায়
সুর	দেবতা, গানের ধ্বনি
শূর	বীর
শিল	পাথর
শীল	চরিত্র
শিশ	শুঁটি
শিস	শব্দ
শিষ	শস্যের মুকুল
জমক	সমারোহ
যমক	অলংকার
জাতি	বর্ণ
জাতী	মালতীফুল
জাম	ফলবিশেষ
যাম	প্রহর
বারি	জল
বারী	হাতি বাঁধার রজ্জু
গাথা	কাহিনি
গাঁথা	গ্রন্থন
বিজন	নির্জন
বীজন	বাতাস
কৃত	সম্পন্ন
ক্রীত	যা কেনা হয়েছে
সাপ	সর্প
শাপ	অভিশাপ
মণ	চল্লিশ সের
মন	অন্তর
মাস	৩০দিন
মাষ	কলাই
রসনা	জিহ্বা
রশনা	মেখলা
যতি	চিহ্ন বিশেষ
যতী	মুনি
জ্যোতি	দীপ্তি
দ্বারা	দিয়ে
দারা	পত্নী
শুচি	শুদ্ধ
সূচি	তালিকা
তরণি	সূর্য
তরণী	নৌকা

অনুশীলনী

১। অর্থ পার্থক্য দেখাও :
সুত ও সূত; দ্বীপ ও দ্বিপ; সুর ও শূর; বাতি ও বাতী; প্রাকার ও প্রকার; নীর ও নীড়; পরি ও পরী; সাক্ষর ও স্বাক্ষর; বিনা ও বীণা; বাড়ি ও বারি।

২। সমোচ্চারিত শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো :
(i) কর্ণ——পুত্র ছিলেন। (সুত ও সূত)
(ii) ——কাল এসব কথা শুনে আসছি। (চির ও চীর)।
(iii) দুঃখ——সুখ লাভ হয় না। (বিনা ও বীণা)
(iv) সব ——ম্যালেরিয়া নয়। (জড় ও জ্বর)
(v) বড়ো বড়ো ——জলে ভরা থাকত। (জ্বালা ও জালা)।

৩। সমোচ্চারিত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করো :
(i) গ্রীষ্মকালে কালো——পাওয়া যায়। (যাম ও জাম)
(ii) রাজা ——বাস করেন। (প্রসাদ ও প্রাসাদ)
(iii) হোটেলের খাবারে——তৃপ্ত হয়। (রসনা ও রশনা)
(iv) রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব——লিখতেন। (পদ্য ও পদ্ম)

৪। বন্ধনী থেকে ঠিক অর্থটি বেছে নাও :
দ্বিপ, আপণ, কূজন, ধনি, নীর, বসন, গিরীশ, অন্য, আশা, জড়, নারা, শুচি, সুত, শর, বিনা।
(হাতি, দোকান, বস্ত্র, মন্দ লোক, রমণী, জল, দুর্গ, অলস, ছাড়া, তির, পুত্র, শুদ্ধ, স্ত্রী, মহাদেব, অশ্ব)

৫। বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিকের শব্দগুলি সমন্বয় করো :

১। কমল — দোকান
২। অসিত — মূল্য
৩। অসার — পায়রা
৪। কপোত — আম
৫। চূত — ছাড়া
৬। কপোল — অট্টালিকা
৭। পাখা — মহাদেব
৮। প্রাসাদ — কাব্যের অধ্যায়
৯। সুর — খারাপ লোক
১০। অর্ঘ — কালো
১১। আপণ — পদ্ম
১২। উপাধান — হস্তী
১৩। দ্বিপ — জলকণা
১৪। গিরিশ — ডানা
১৫। বিনা — গাল
১৬। সর্গ — বালিশ
১৭। কূজন — ধোঁয়া
১৮। ধূম — দেবতা।

৬। ঠিক উত্তরটি বেছে নাও
ক) প্রকার — রকম / প্রাচীর
খ) আপন--- দোকান / নিজের
গ) নীর—বারি / বাসা
ঘ) দ্বিপ — হাতি / প্রদীপ
ঙ) গিরিশ— মহাদেব / হিমালয়।
চ) বিজন — নির্জন / বাতাস
ছ) সাপ — অভিশাপ / সর্প
জ) লক্ষ — সংখ্যা / উদ্দেশ্য
ঝ) বৃন্ত — বোঁটা / সবই
ঞ) জাম — ফল / প্রহর